পুরাণ-কথা



পুরাণ-কথা

বাণী গুপ্ত

ও রি য়ে ণ্ট লং ম্যা ন্স

কলিকাতা • বোম্বাই • মাদ্রাজ

সমুদ্র-মন্থন

দেবরাজ ইন্দ্র চলেছেন স্বর্গের পথে। দেখা হল দুর্বাসার সঙ্গে। দুর্বাসা হলেন ভীষণ রাগী মুনি। এদিকে খুব বড় তপস্বী। তাঁর তপস্যার বলে তিনি ত্রিভুবনের সকলের চেয়ে শক্তিশালী। মানুষ তো দূরের কথা, স্বয়ং দেবতারাও তাঁকে দেখে ভয় পান। দুর্বাসা যদি রেগে যান তাঁর অভিশাপে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাই দেবতা, মানুষ সকলেই এই রাগী মুনিটিকে একটু দূরে রেখেই চলেন।

সেই দুর্বাসার সঙ্গে দেখা দেবরাজ ইন্দ্রের। ইন্দ্র তো ভয়ে ভয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁকে প্রণাম করলেন। প্রণাম করে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। দুর্বাসার মনটা সেদিন ভালই ছিল। প্রসন্নমনে আশীর্বাদ করলেন ইন্দ্রকে; হাতে ছিল ভারী সুন্দর একটি ফুল। আশীর্বাদী ফুলটি দিলেন ইন্দ্রের হাতে। ইন্দ্র তো দুহাত জোড় করে সেই আশীর্বাদী ফুল নিলেন। তারপর দুর্বাসা নানাকথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ইন্দ্রও বিনীতভাবে দুর্বাসার কুশল প্রশ্ন করলেন। এমনি কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে দেবরাজ কখন অন্যমনস্ক হয়ে হাতের ফুলটি নাড়াচাড়া করতে করতে তাঁর আদরের হাতীটির মাথায় পরিয়ে দিলেন। হাতী তো আর জানে না সে ফুলের কি দাম! শুঁড়ে করে মাথার ফুল নিয়ে এল। ফেলল পায়ের নীচে। আর কি সর্বনাশ! ঠিক সেই মুহূর্তেই দুর্বাসা মুনির চোখ পড়েছে সেই ফুলটির দিকে। দুর্বাসার আশীর্বাদী ফুলের এই অপমান। ক্রোধে সমস্ত শরীর কাঁপতে

অসুরদের কুলগুরু ছিলেন শুক্রাচার্য। শুক্র ছিলেন খুব পণ্ডিত। আর তিনি জানতেন এমন একটা মন্ত্র, যে মন্ত্র দিয়ে তিনি মরা বাঁচাতে পারতেন। সে মন্ত্রের নাম মৃতসঞ্জীবনী। সঞ্জীবনী কথাটির অর্থ বাঁচাবার ক্ষমতা। এই মৃতসঞ্জীবনীর মন্ত্র দিয়ে শুক্রাচার্য্য দেবদানবের যুদ্ধে যে সব দানব মারা যেত তাঁদের বাঁচিয়ে দিতেন। দেবতাদের কুলগুরু বৃহস্পতি যদিও খুব বিদ্বান ছিলেন, তিনি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র তো জানতেন না, কাজেই মৃত-দেবতাদের তো আর বাঁচাতে পারতেন না। সেইজন্য দেবতারা তখনও অমর হয়নি বলে মারা যেতেন আর অসুরেরা মন্ত্রে বেঁচে উঠত। দেবতারা দিনে দিনে সংখ্যায় কমে যেতে লাগলেন।

ঠিক এই সময়ে আবার দুর্বাসার অভিশাপ 'হতশ্রী হও'। সত্যই স্বর্গ হতশ্রী হয়ে গেল। অসুরদের আক্রমণে দিনে দিনে দেবতারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। শেষে একদিন সবাই গেলেন ব্রহ্মার কাছে। করজোড়ে তাঁরা বল্লেন,—হে পিতামহ, তুমি আমাদের রক্ষা কর। দুর্বাসার শাপে স্বর্গ হতশ্রী। শুক্রাচার্যের মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের বলে অসুরজাতি মহাশক্তিশালী। দেবতারা বড় বিপন্ন। তুমি ছাড়া কেউই আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না।

ব্রহ্মা দেবতাদের বিপদ শুনলেন। তারপর শিবকে সঙ্গে করে নিয়ে সকলে এলেন বিষ্ণুর কাছে। নারায়ণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনারা কি জন্য আমার কাছে এসেছেন ?

ব্রহ্মা তখন নারায়ণকে বল্লেন,—হে নারায়ণ, দেবতাদের বিপদ তুমি নিশ্চয়ই জান। কি করলে স্বর্গ এই বিষম বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে তার উপায় তুমি কর।

লাগল তাঁর। দুচোখে যেন আগুন জ্বলতে লাগল। ভ্রূকুটি করে অভিশাপ দিলেন দুর্বাসা দেবরাজ ইন্দ্রকে। বল্লেন,—দেবরাজ ইন্দ্র হয়ে তোমার গর্ব আর অহঙ্কার এত বেশী বেড়েছে। তুমি আমার আশীর্বাদের অপমান করলে। যে ঐশ্বর্য্য, যে সম্পদের জন্য তোমার এই অহঙ্কার সে ঐশ্বর্য্য তোমার আর থাকবে না। দেবতাদের স্বর্গ আর শোভাসম্পদপূর্ণ স্বর্গ থাকবে না। তুমি হতশ্রী হবে। দুর্বাসা চলে গেলেন। ইন্দ্রদেব অনেক অনুরোধ করেও তাঁর রাগ শান্ত করতে পারলেন না। সমস্ত স্বর্গ হতশ্রী হয়ে গেল। 'শ্রী' কথাটির মানে হল লক্ষ্মী। হতশ্রী মানে হল লক্ষ্মীহীন হওয়া। যেখানে শ্রী নেই সেখানে লক্ষ্মী নেই অমন যে স্বর্গ দুর্বাসার অভিশাপে একবারে 'শ্রী' হীন হয়ে গেল। শ্রী নেই শান্তি নেই—শক্তি নেই। স্বর্গের সে এক বিষম অবস্থা। দেবতাদের সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে গেল। আর দেবরাজ ইন্দ্র তো শাপগ্রস্ত হয়ে দুঃখে কষ্টে দিন কাটাতে লাগলেন।

কিন্তু এতেও রক্ষা নেই। দেবতারা শক্তিহীন হলে সুযোগ সুবিধা বুঝে দেবতাদের পরম শত্রু অসুরেরা তাদের আক্রমণ করতে লাগল। দেবতারা কেবলই হেরে যান। অসুররাও তো কম নয়। মহামুনি কশ্যপের দুই স্ত্রী ছিলেন, দিতি আর অদিতি। দিতির ছেলেরা হলেন দানব আর অদিতির ছেলেরা হলেন দেবতা। দেবতারা হলেন মহাধার্ম্মিক আর অসুরেরা মহা বলবান। এই দুই দল—অর্থাৎ সুর আর অসুর, এদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি বেধেই থাকত। দেবতারা ছিলেন ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান আর উদার। কিন্তু দেহের শক্তি বা দুষ্টবুদ্ধিতে কিছুতেই দানবদের সঙ্গে পেরে উঠতেন না। তার উপর দেবতাদের আর একটা খুব অসুবিধা ছিল।

তখন বিষ্ণু বল্লেন,—পিতামহ, অসুরেরা অত্যন্ত বলশালী এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান। বিশেষতঃ শুক্রাচার্য আবার মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জানেন। কাজেই দেবতারা কিছুতেই তাদের সঙ্গে পেরে উঠেন না। আমার মনে হয়, দেবতাদের উচিত অমৃত-লাভের চেষ্টা করা।

দেবরাজ ইন্দ্র আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন,—হে নারায়ণ, সে অমৃত কি ?

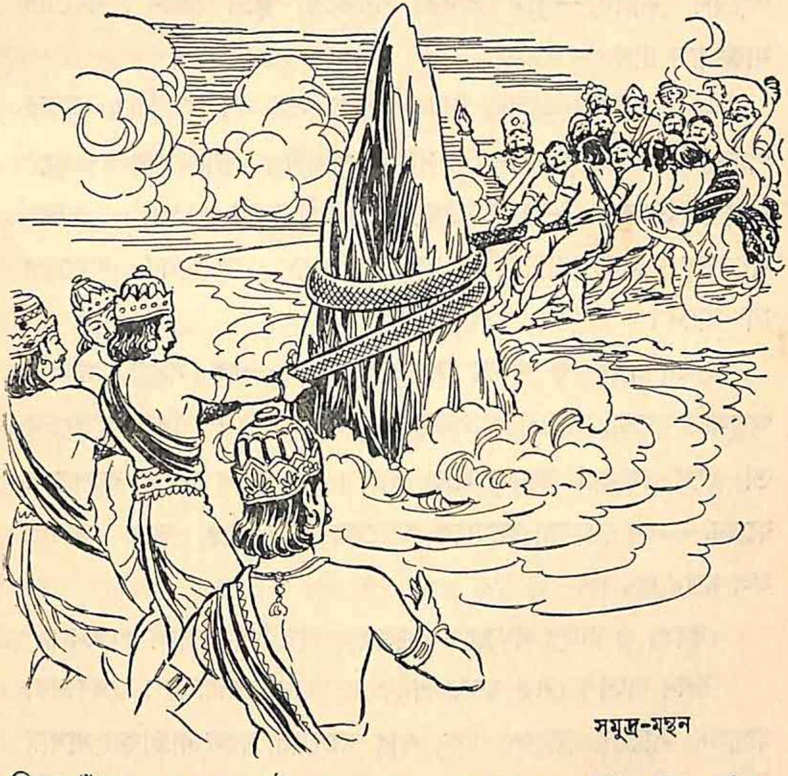
নারায়ণ বল্লেন,—অমৃত হল সুধা যা থেকে দেবতারা নতুন জীবন লাভ করবেন, নতুন শক্তি লাভ হবে তাঁদের ; মৃত্যু তাঁদের কাছে আসতে পারবে না। এই অমৃত পানে দেবতারা হবেন অমর।

ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করলেন,—প্রভু, সে অমৃত কোথায় আছে ? দেবতারা কি উপায়েই বা সে অমৃত লাভ করবেন ?

বিষ্ণু বল্লেন,—সুধার মত এই অমৃত ক্ষীরোদ সাগরে আছে। এই অমৃতকে লাভ করতে হলে দেবতাদের সমুদ্র মন্থন করতে হবে। সমুদ্র মন্থন করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। মন্দর পর্বতকে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে বসাতে হবে। মন্দর হবে মন্থন দণ্ড, নাগরাজ বাসুকি হবেন মন্থনের দড়ি। বাসুকির দেহ দিয়ে বাঁধতে হবে মন্দর পর্বত। সেই দড়ির একপাশ ধরবে দেবতারা এবং অন্য পাশ ধরবে দানবেরা।

বিষ্ণুর পরামর্শে দেবতারা গেলেন দানবদের কাছে। তাদের সঙ্গে সন্ধি অর্থাৎ বন্ধুত্ব করলেন। দুই দল মিলে ঠিক করলেন সমুদ্র মন্থন করবেন। আর এও ঠিক হল, অমৃত পাওয়া গেলে দেবতা ও দানব এই দুই দলই তা ভাগ করে নেবেন।

তখন দেবতা আর দানবেরা গেলেন মন্দর পর্বতের কাছে। তাকে তুলে আনতে হবে, ফেলতে হবে সমুদ্রের মাঝখানে।



সমুদ্র-মন্থন

কিন্তু তাঁদের অনেক চেষ্টাতেও মন্দর পর্বতকে আনা গেল না। সে কি যে সে পাহাড়? তখন দেব ও দানব আবার ফিরে গেলেন বিষ্ণু ও ব্রহ্মার কাছে। বল্লেন,—হে প্রভু! মন্দর পর্বতকে আমরা কিছুতেই আনতে পারলাম না। আপনারা কৃপা করে আমাদের সাহায্য করুন।

তখন নারায়ণ ডাকলেন সর্পরাজ বাসুকিকে। সর্পরাজ বাসুকি এলেন। তাঁর মাথায় একটি নয়, দুইটি নয়, হাজার

ফণা। ভগবান নারায়ণ যখন ক্ষীরোদ সাগরের উপরে নিদ্রা যান, তখন এই বাসুকি হয় তাঁর শয্যা। নারায়ণ বাসুকিকে আদেশ দিলেন,—তুমি মন্দর পর্বতকে তুলে এনে সমুদ্রের মাঝখানে রাখ।

তখন বাসুকি এলেন, তাঁর বিশাল লম্বা শরীর দিয়ে মন্দর পর্বতকে টেনে তুললেন। সমস্ত পৃথিবী সে টানে থর থর করে কেঁপে উঠল। ভয়ে ত্রিজগতের প্রাণী ছুটে পালাল। মন্দর পর্বতকে অতি সহজেই বাসুকি এনে ফেললেন সমুদ্রের মাঝখানে।

তখন দেব ও দানব সমুদ্রকে বল্লেন,—হে সমুদ্র, আপনি অনুমতি করুন, আমরা আপনার জল মন্থন করি। বিষ্ণু বলেছেন তা হলে আমরা অমৃত লাভ করব। সমুদ্রের দেবতা বরুণদেব বল্লেন,—যদি তোমরা আমাকে অমৃতের ভাগ দাও, তবে আমার জল মন্থন কর।

দেবতা ও অসুর সমুদ্রকে অমৃতের ভাগ দিতে রাজী হলেন।

তখন বাসুকি সেই মন্দর পর্বতকে জড়িয়ে ধরলেন। দেবতারা ধরলেন সাপের লেজের দিক, আর অসুরেরা ধরল বাসুকির মাথার দিক। তারপর সমুদ্র-মন্থন সুরু হল।

দিন গেল, মাস গেল, বৎসরও গেল ঘুরে, সমুদ্র মন্থনের আর শেষ নেই।

সে মন্থনে সমুদ্রের জল ফেনায় ভর্ত্তি হয়ে গেল। কত যে জলের বিশাল বিশাল প্রাণী মারা গেল ঠিক নেই। আর অত্যন্ত পরিশ্রমে বাসুকি নাগের হাজারটা ফণা দিয়ে নিঃশ্বাস বইতে লাগল ভীষণ ভাবে। সে নিঃশ্বাস আবার যেমন তেমন নয়।

সাপের নিঃশ্বাস তো। সে নিঃশ্বাসে আগুণ জ্বলতে লাগল লক্ লক্ করে। আর ধোঁয়ায় ভরে গেল সমস্ত জগৎ।

এদিকে আর এক বিপদ। মন্থনের ফলে মন্দর পর্বত ধীরে ধীরে ক্ষীরোদ সাগরের জলে ডুবে যেতে লাগল। তখন দেব দানব সকলে মিলে আবার নারায়ণকে ডাকলেন। ডুবে যাওয়া মন্দরকে তুলতে হবে, নইলে মন্থন হবে না। তখন নারায়ণ কূর্মের রূপ নিলেন। কূর্ম অর্থাৎ কচ্ছপ। সেই বিশাল কূর্ম ক্ষীরোদ সাগরের জলে নামলেন। মন্দর পর্বতকে তাঁর পিঠের উপর তুলে বসালেন। পাহাড় আবার ভেসে উঠল।

সমুদ্র মন্থন আবার চলল। সাপের নিঃশ্বাসে জ্বলছে আগুন। দেবরাজ ইন্দ্র বৃষ্টি আনলেন। সে বৃষ্টিতে আগুন নিভল। আর একটা জিনিস হল। মন্থনের সময়ে সমুদ্রের জলে হাজার হাজার রকম লতা পাতা, ওষুধের গাছ ভেসে এসেছিল। তাদের রস মিশল সমুদ্রের জলে। সাগরের জল এই ওষুধের রসের সঙ্গে মিশে দুধ হয়ে গেল। ক্ষীরোদ সাগরের জল সেই থেকে দুধের মত। ক্ষীর মানে দুধ। উদ বা উদক মানে জল।

মন্থনের কাজ চলেছে তো চলেছেই। তারপর বহুদিন পর সেই মন্থনকরা সাগরজলে ভেসে উঠল চমৎকার সাদা সুন্দর একটি গাভী। তার নাম সুরভি। এই গাভীটি কামধেনু। এর বাঁটে সারাক্ষণই ক্ষীরের মত দুধে ভরা। আর তা ছাড়া এর আর একটি অদ্ভুত গুণ। এর পূজা করলে মানুষের কোনও অভাব থাকে না। কামনা পূর্ণ করে বলেই এর নাম কামধেনু। এই কামধেনু সুরভি সমুদ্রের জলে ভেসে উঠল। ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে মুনি-ঋষিরা ছিলেন। তাঁরা দেখতে এসেছিলেন মন্থন।

নারায়ণের কাছে তাঁরা সুরভিকে চাইলেন। সুরভির পুণ্য দুধে তৈরী হবে ঘি। আর সেই ঘি দিয়ে ঋষিরা যজ্ঞ করবেন। নারায়ণ সুরভিকে দান করলেন ঋষিদের।

মন্থন চলেছে।—

এবার উঠে এল দুধের মত ধবধবে সাদা একটি ঘোড়া। নাম উচ্চৈঃশ্রবা।

ইন্দ্র বল্লেন,—আমি স্বর্গের রাজা। এমন একটি ঘোড়া আমারই পাওয়া উচিত। এটি আমি নেব।

দৈত্যরাজ বলিও ছিলেন সেখানে। তাঁরও ইচ্ছা কম নয়। কিন্তু নারায়ণের ভয়ে কিছুই বল্লেন না।

উচ্চৈঃশ্রবার পর উঠল ঐরাবত।

বিশাল মেঘের মত চেহারা তার। হাতীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্র আবারও বল্লেন,—আমি ত্রিভুবনের রাজা। এ হাতীটিও আমার। এই আমার যোগ্য বাহন।

এরপর ক্ষীরোদ সাগরের জলে ভেসে উঠল অপূর্ব এক নীলকান্তমণি। তার নীল আলোয় চারিদিক আলো হয়ে গেল। দেবতা-দানব, যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব সকলেই এই উজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে মণিটি দেখে বিস্ময় বোধ করলেন। নারায়ণ নিলেন মণিটিকে। নারায়ণের বুকে মণিটি সূর্য্যের মত জ্বলতে লাগল। এর নাম কৌস্তুভ মণি।

মন্থন কিন্তু সমানেই চলেছে। অমৃত পাওয়া চাই-ই। সমুদ্রের বুক আলো হয়ে উঠল আবার।

সোনার আলোয় গড়া চাঁদ উঠলো সমুদ্রের বুক থেকে।

আকাশ আলোয় আলো হল। পৃথিবীতে রাত্রির আঁধার আর রইল না।

সমুদ্র থেকে উঠলেন সুরাদেবী। সুরা—অর্থাৎ মদ। দেবীর নাম বারুণী—সমুদ্রের রাজা বরুণের কন্যা—তাই তাঁর নাম বারুণী।

বারুণী উঠলেন সাগর-জল থেকে।

কি অপূর্ব্ব রূপ। দেবতা দানব দুই দলই ভাবতে লাগল কে তাকে নেবে।

বারুণী দেবী কিন্তু দেবতাদের কাছেই গেলেন। সুরা গ্রহণ করলেন বলেই দেবতারা সুর—আর সুরা গ্রহণ করলেন না বলেই দেবতারা অ-সুর।

এরপর সমুদ্রের জল থেকে উঠলেন আর একটি নারী। ত্রিভুবনে তাঁর রূপের তুলনা নেই। মেয়েটি নাচে গানে শ্রেষ্ঠ। এর নাম উর্বশী। দেবরাজ ইন্দ্র বল্লেন,—উর্বশী আমার স্বর্গের নর্ত্তকী হবে, তার নাচে গানে দেবতাদের খুশী করাবে। এর পর এল সমুদ্র থেকে হাজার হাজার রূপসী মেয়েরা। তারা অপ্সরী নামে পরিচিত। ক্ষীরোদ সাগরের জলের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সার জিনিস নিয়ে তৈরী, তাই এরা অপ্‌সরা। অপ্‌ কথাটির অর্থ জল। জলের সার।

এরপর সমুদ্র থেকে ভেসে এল পারিজাত ফুল। এমন অপূর্ব ফুল কেউ কোথাও দেখেনি। ইন্দ্র দেবরাজ বলে সেই পারিজাত ফুলটিও তিনিই নিলেন।

কিন্তু এতেও থামলে চলবে না। স্বর্গ হতশ্রী হয়েছে। দুর্বাসার অভিশাপে দেবতারা শক্তিহীন। শ্রীকে চাই—তাই চাই অমৃত।

অবশেষে সমুদ্রের দশদিক আলো হয়ে গেল। লালপদ্ম ফুটে

উঠল ক্ষীর সাগরের বুকে। কে আসছেন এবার ? এত আলো কেন ? আবারও কি চাঁদ উঠেছেন নাকি পাতাল থেকে ?

পদ্মফুল ফুটেছে। কোথা থেকে ভ্রমর এল ছুটে। অপূর্ব্ব সুন্দর সুবাসে ভরে গেছে ত্রিভুবন। ঋষিরা স্তব পাঠ করতে লাগলেন, দেবতা-দানব ভয়ে আনন্দে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। সোনার মুকুট আর সোনার কাপড় পরা—সোনার মত মেয়ে ভেসে উঠলেন জলের উপরে। পদ্মের আসনে বসে আছেন। পায়ের নীচে ফুটেছে পদ্ম, এক হাতে সোনার ঝাঁপি—আর হাতে পাকা ধানের সোনালী ছড়া। লক্ষ্মী এলেন পাতাল ছেড়ে, আর লক্ষ্মীর মুখের হাসিতে শ্রী এল স্বর্গপুরে। আকাশে শ্রী, বাতাসে শ্রী। ত্রিভুবন উথলে উঠল লক্ষ্মীর পায়ের স্পর্শে। কে নেবে এই লক্ষ্মীকে ? কাকে আশ্রয় করবেন লক্ষ্মী ? দেবতা না দানব ?

পদ্মের আসন থেকে নামলেন লক্ষ্মী। দেবতাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আর নারায়ণের পাশটিতে এসে নিজের হাতে গাঁথা মালাটি পরিয়ে দিলেন নারায়ণের গলায়।

লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্ত্তি দেখে ত্রিলোক আনন্দিত হল। কেবল মাত্র অসুরদের মুখ কালো হয়ে উঠল। কিছুই কি তারা পাবে না। বাসুকির হাজার ফণার নিঃশ্বাসে—বিষে তারা জর্জ্জরিত।

কিন্তু মন্থন চলেছেই।

অমৃত এখনও আসে নি। তা পেতে হবেই। অবশেষে সমুদ্র থেকে উঠলেন চিকিৎসক ধন্বন্তরী। তাঁর ডানহাতে একটি শাদা কমণ্ডলু।

কমণ্ডলুতে অমৃত।

কে পাবে অমৃত—দেবতা না দানব ?

কিন্তু সে পরের কথা। দেবতা ও দানব উভয়েই ভাবলেন, —সমুদ্রের তলদেশে আছে আরও কত জিনিস। কাজেই মন্থন থামানো হবে না।

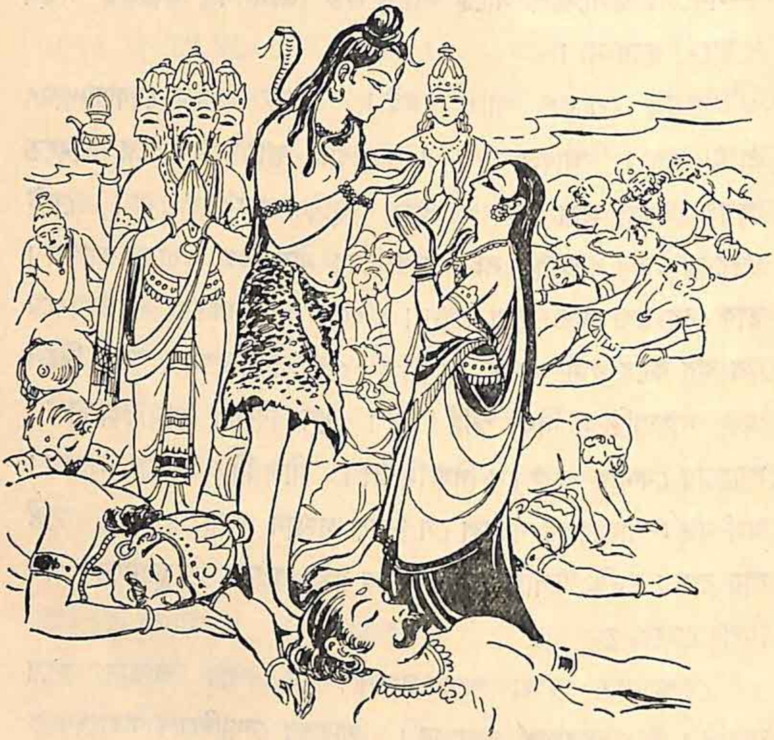
অমৃত পেয়েও শান্তি নেই। লোভে তখন দেবতা-দানব প্রায় অন্ধ। আবার মন্থন। আবার বাসুকিকে ধরে টানতে লাগল দেবতা আর দানব। আর বাসুকির সহ্য হল না। সেই মন্থনের টানে বাসুকির সহস্র মুখ দিয়ে নীল বিষ ঝরতে লাগল। তার দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। অসুর ও দেবতার শরীর দিয়ে ঝর ঝর করে ঘাম ঝরতে লাগল। সেই বিষ আর ঘাম মিলে এক সাংঘাতিক বিষ সৃষ্টি হল। সে বিষের নাম কালকূট। সমুদ্রের ফেনার সঙ্গে সে বিষ মিশল। নীল বিষ জ্বলতে লাগল। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের সকলে সে বিষে অজ্ঞান হয়ে গেল। সৃষ্টি যায় যায়। কি উপায় হবে! কে রক্ষা করবে ত্রিভুবনকে এই বিপদ থেকে ?

কেবলমাত্র ব্রহ্মা আর নারায়ণ সে বিষে অজ্ঞান হয়ে যাননি ; তাঁরা পরামর্শ করলেন। তারপর দেবাদিদেব মহাদেবকে স্মরণ করলেন। সকল দেবের বড় তাই তিনি দেবাদিদেব।

দেবাদিদেব শিব এলেন। ব্রহ্মা তাঁকে বিপদের কথা বল্লেন। কে রক্ষা করবে পৃথিবীকে, স্বর্গকে, মর্ত্যকে, একমাত্র শিব ছাড়া ?

শিব এসে দাঁড়ালেন ক্ষীর সাগরের পারে। নীল বিষ ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে। দুহাত ভরে তিনি সে বিষ সব নিলেন। ভয়ে চুপ করে রইল সবাই। পার্ব্বতী ব্যাকুল হয়ে শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন,—হে দেবাদিদেব! কালকূটের তীব্র

বিষে তিন ভুবনের সবাই প্রায় মৃত। দেবতারাও চেতনা হারিয়েছেন। আপনি কোন সাহসে সে বিষ পান করবেন ?



মহাদেবের কালকূট পান

শিব বল্লেন,—পার্ব্বতী ! দেবতা ও দানব আজ আমার শরণ নিয়েছে। তারা শরণাগত। শরণাগতকে রক্ষা করা বড় ধর্ম।

পার্ব্বতী বল্লেন,—কিন্তু প্রভু ! সমুদ্র মন্থন করে কত সুন্দর জিনিষ উঠেছে। দেবতারা সবই নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন। আপনাকে তাঁরা কিছুই দেন নি। এখন এই সর্বনাশা কালকূটই বা আপনি নেবেন কেন ?

শিব হাসলেন, বল্লেন,—পার্ব্বতী ! আমাকে ওরা বলে মহাদেব—সকল দেবের শ্রেষ্ঠ। তাই যে জিনিষ অন্য দেবতা সইতেও পারে না তাকে একমাত্র আমিই নিতে পারি।

পার্ব্বতী প্রণাম করলেন শিবকে।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু করজোড়ে প্রার্থনা করলেন, বল্লেন,—হে দেবাদিদেব, শরণাগতকে রক্ষা কর।

শিব নিশ্চিন্ত মনে পান করলেন হলাহল বিষ ! কিন্তু সে বিষকে তিনি গলায় ধরে রাখলেন—তার নীচে নামতে দিলেন না। দেখতে দেখতে শিবের শুভ্রকণ্ঠ নীল হয়ে উঠল বিষের জ্বালায়। শিব হলেন নীলকণ্ঠ !

ত্রিভুবন চোখ মেলে চাইল—জয়ধ্বনি করে উঠল দেবাদিদেব মহাদেবের। জয় নীলকণ্ঠ শিব !

চেতনা ফিরল দেবতা ও দানবের। দানবেরা চোখ মেলেই দেখল অমৃতভরা কলসীটি। বিষে ধন্বন্তরীও অজ্ঞান হয়েছিলেন কিনা। তাঁর হাত থেকে খসে পড়েছিল অমৃতের কলসীটি।

দানবেরা এতক্ষণ চুপ করেছিল। তারা কিছুই পায়নি সমুদ্র মন্থনের ফলে। অথচ বেশী পরিশ্রম তারাই করেছে। বাসুকির হাজারটা ফণার বিষে তাদেরই কষ্ট হয়েছে বেশী। তাদের সমস্ত দেহ ঝলসে গেছে। মনে মনে তারা খুবই রেগে গেছে। তাই যখন অমৃতের কলসীটি তারা চোখের সামনে দেখতে পেল তখনই তারা কলসীটি নিয়ে পালিয়ে গেল।

অমৃত হাতছাড়া হয়ে গেল। দেবতাদের আর দুঃখের শেষ নেই। তাঁরা দুঃখিত মনে নারায়ণের কাছে গেলেন। বল্লেন,—

হে নারায়ণ! এতদিন এত দুঃখ কষ্ট করে অমৃত পেলাম। কিন্তু লোভী দানবেরা আমাদের ফাঁকি দিয়ে অমৃত নিয়ে গেছে। এখন আমরা কি করি? কেমন করে পাই সেই অমৃত?

দেবতাদের নারায়ণ বড় ভালবাসেন। তাঁদের দুঃখ দেখে তিনি দুঃখিত হলেন, বল্লেন,—দেবগণ, তোমরা দুঃখিত হয়ো না। আমি তোমাদের অমৃত এনে দেব।

ওদিকে দৈত্যপুরীতে তখন ভারী গোলমাল। একদল অসুর বলে,—দেবতারা লোভী, দেবতারা হিংসুক, তারা আমাদের ফাঁকি দিয়েছে, আমরাও তাদের অমৃত দেব না।

আর একদল বলে,—এ অন্যায়। সমুদ্র মন্থনে দেবদানব দুই দলই পরিশ্রম করেছে। অমৃত দুই দলই পাবে।

প্রথম দল বলে,—কিন্তু তারা তো আমাদের কিছু দেয়নি। দেয়নি উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত; পাইনি আমরা কৌস্তুভমণি, পারিজাত; আর অমন যে তিন ভুবনের সেরা শ্রীলক্ষ্মী তিনিও তো এলেন না আমাদের কাছে। আমরা পেয়েছি শুধু দুঃখ আর কষ্ট। আমাদের দেহ ঝলসে গেছে সাপের বিষে। আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে বারে বারে। অমৃত আমরাই নেব। দেবতাদের দেব না।

এমনি তুমুল ঝগড়া বিবাদ।

হঠাৎ কে বললে ভারী মধুর কণ্ঠে,—আমি তোমাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিচ্ছি এস।

দানবেরা চমকে ফিরে চাইল।

ভারী সুন্দর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, গায়ের রং তার কালো। কিন্তু কি পরমাসুন্দরী মেয়েটি। অল্প অল্প হাসি মুখে ফুটেছে। কাজলটানা চোখদুটিতে তার হাসি মাখানো। অসুরেরা তো

অবাক। সমুদ্র মন্থনে এ মেয়েটিতো ওঠেনি। কিন্তু দেখতে বোধহয় উর্ব্বশীর চেয়েও সুন্দরী। ওরা জিজ্ঞাসা করল মেয়েটিকে,—তোমার নাম কি? মেয়েটি হেসে হেসে বল্ল,—আমার নাম মোহিনী।

মোহিনী মানে যে মুগ্ধ করে। তাই বটে। অসুরেরা মোহিনীর রূপে একেবারে মুগ্ধ। তারা ভাবল থাকগে, নাই বা পেলাম উর্ব্বশীকে। মোহিনীকে পেলেও আমাদের দুঃখ থাকবে না।

মোহিনী কিন্তু ততক্ষণে ওদের মন বুঝে নিয়েছে। মোহিনী আর কেউ নন। নারায়ণ নিজে এসেছেন এই মোহিনীর মূর্ত্তি ধরে। অসুরদের ভুলিয়ে নিয়ে যাবেন অমৃত।

মোহিনী বল্ল,—কি নিয়ে তোমাদের ঝগড়া, বলত?

অসুররা তাকে সবকথা খুলে বল্ল। ভাল অসুরেরা মোহিনীকে বল্ল,—দেখ দেবতা আর অসুর দুজনেই মহামুনি কশ্যপের ছেলে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি ভাল নয়। আমরা চাই দেবতা আর অসুর দুইদলই সমানভাবে অমৃত পাক।

মোহিনী বল্লেন,—তাই হবে। তোমরা দেবদৈত্য সকলে স্নান করে পরিষ্কার জামাকাপড় পরে এস। আমি সমান ভাগে অমৃত ভাগ করে দেব। কিন্তু একটি কথা রাখতে হবে।

অসুররা জিজ্ঞাসা করল,—বল কি কথা! আমরা তোমার সব কথাই রাখব।

মোহিনী বল্লেন,—আমি অমৃত ভাগ করে দেব। তোমরা আমার ইচ্ছাতে বাধা দিতে পারবে না। আমার যা ইচ্ছা তাই করব।

অসুরেরা প্রতিজ্ঞা করল যে মোহিনীর যা ইচ্ছা তাই সে করবে। তারা একটিও কথা বলবে না।

তখন দেবতা আর দানব দুই দলই স্নান করে এল। নতুন কাপড় পরে পরিচ্ছন্ন হয়ে এল তারা। তারপরে দুইদলে ভাগ হয়ে তারা খেতে বসল। মোহিনী বেশে নারায়ণ অমৃত-কলসীটি নিয়ে এলেন। মনে মনে তাঁর ঠিক করাই ছিল অসুরদের একটুও অমৃত তিনি দেবেন না।

মিষ্টি কথা আর মিষ্টি হাসিতে ভুলে রইল অসুরেরা। মোহিনী ভাগ করে দিলেন অমৃত দেবতাদের পাতে। অসুররা বুঝতেও পারল না তাদের ক্ষতি।

এদিকে রাহু নামে এক অসুর দেবতাদের ছদ্মবেশে বসে ছিল দেবতাদের সঙ্গে। মোহিনী তাকে অমৃত দিয়ে গেছেন দেবতা মনে করে। বেচারী তাড়াতাড়ি মুখে দিয়েছে। এর মধ্যে চন্দ্র আর সূর্য্য জানতে পেরে নারায়ণকে বলে দিল। নারায়ণ সুদর্শনচক্র দিয়ে রাহুর গলা কেটে ফেললেন। অমৃত গলা পর্য্যন্ত নেমেছিল সেজন্য বেচারার মাথাটুকু অমর হয়ে রইল। আর সেই জন্য তখন থেকে রাহুর রাগ চন্দ্র আর সূর্য্যের পরে। লোকে বলে, তাই হয় সূর্য্যগ্রহণ আর চন্দ্রগ্রহণ।

অমৃত শেষ হয়ে গেল। অসুররা বুঝল কি ভীষণভাবে তারা ঠকেছে। পরিশ্রম দিয়ে যে অমৃত তুলল সে অমৃত তারা পেল না। তারা ছুটে এল দেবতাদের দিকে। কিন্তু দেবতারা আর দুর্বল নন। হতশ্রী দেবলোক লক্ষ্মীকে পেয়েছে। দেবতারা অমৃত পান করে অমর হয়েছেন। অসুরদের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধে আর ভয় নেই।

অসুররাও ছাড়বে না। তারা ঠকেছে—ভীষণভাবে ঠকেছে। তার শোধ তারা নেবেই। দেবতা আর অসুরের যুদ্ধের আর

শেষ নেই। দেবতারা অমৃত দিলেন না দানবদের। তাতে ঝগড়াবিবাদও থামল না। দেবতারা যদি অমৃত দিতেন তাহলে হয়তো বা দানবদের সঙ্গে নতুন করে যুদ্ধ আর বাধত না। দেবতাদের হাতে না ঠকলে হয়তো দানবদের এত রাগও থাকত না। হয়তো বা ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে এমন ঘন ঘন যুদ্ধের কোলাহল শোনা যেত না।

I.C.S.S.R. Library
Date 3.7.2006
Acc. No. 12200
I.C.S.S.R. Library, Calcutta

যযাতি ও পুরু

অসুরদের কুলগুরু শুক্রাচার্য।

অসুররাজ্যে তাঁর ভীষণ ক্ষমতা। ভারী প্রতাপ। মরাকে বাঁচিয়ে তোলার মন্ত্র তিনি জানেন। সে মন্ত্রের নাম হল মৃত-সঞ্জীবনী। দেবতা আর অসুরে তো যুদ্ধ লেগেই আছে। মারামারি, কাটাকাটি তারা সব সময়েই করছে। অসুররা মরছেও কি কম। কিন্তু সারাদিন যুদ্ধের পর শুক্রাচার্য যেই তাঁর মন্ত্রপড়া জলটি ছড়িয়ে দিয়ে অসুরদের নাম ধরে ডাকেন, তক্ষুণি বেঁচে ওঠে তারা। যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছে তারা!

কাজেই শুক্রাচার্যকে না হলে অসুররাজ্য চলে না এক মুহূর্তও। আর সেইজন্যই শুক্রাচার্যের ভারী খাতির আর সম্মান। অসুররাজ বৃষপর্বাও তাঁকে খুব ভক্তি করতেন।

শুক্রাচার্যের মেয়ের নাম দেবযানী।

বৃষপর্বার মেয়ের নাম শর্মিষ্ঠা।

দুজনেই পরমাসুন্দরী। আবার দুজনেরই খুব অহঙ্কার। শুক্রের মেয়ে দেবযানী মনে করেন অসুররাজ্যে তাঁর পিতাই সবচেয়ে বড়। মহারাজ বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠা মনে করেন যে তিনি অসুররাজ্যের রাজকন্যা। কাজেই তাঁর মত বড় আর কে?

একদিন অসুরকন্যারা স্নান করতে গেছে নদীতে। নদীর তীরে তাদের জামাকাপড় রয়েছে। সেদিন তখন হাওয়া খুব জোরে বইছিল। সেই হাওয়ায় নদীর পাড়ের সব কাপড়গুলি মিশে গেল। স্নান করে উঠে এল সকলে। রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা ভুল করে

দেবযানীর কাপড় পরলেন। দেবযানী মনে করলেন শর্মিষ্ঠা ইচ্ছা করেই এমন কাজ করেছেন। এ শুধু তাঁকে অপমান করার জন্য। তিনি শর্মিষ্ঠাকে বল্লেন,—তোমার তো সাহস কম নয়! তুমি ইচ্ছা করেই নিশ্চয় আমার কাপড় পরেছ। আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা। তোমার চেয়ে আমি অনেক বড়। তুমি খুব অন্যায় কাজ করেছ।

শর্মিষ্ঠার অহঙ্কারও কম নয়। তিনিও রাগ করে বল্লেন,—তোমার কাপড় আমি না জেনেই পরেছি। কিন্তু তাতে তোমার রাগ করার কি আছে। আমি মহারাজ বৃষপর্বার মেয়ে। অসুরদেশের রাজকন্যা। আমার সঙ্গে তোমার তুলনাই হয় না।

এইভাবে খুব ঝগড়া হতে লাগল দুইজনে। কেউই কম যান না। কেউই ছাড়বার পাত্রী নন। শর্মিষ্ঠা হলেন রাজকন্যা—দেবযানী গুরুকন্যা। ঝগড়া হতে হতে শেষে শর্মিষ্ঠা ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি দেবযানীকে ধাক্কা দিয়ে একটা কূপের মধ্যে ফেলে দিলেন। তারপর সখীদের নিয়ে রাজপুরীতে ফিরে গেলেন। কেবল দেবযানীর যে দাসী তাকে মানুষ করেছিল সে সেই কূপের পাশে বসে কাঁদতে লাগল। আর বেচারী দেবযানী? অন্ধকার কূপের মধ্যে পড়ে গিয়ে খুবই ব্যথা পেলেন। আর তার চেয়েও বেশী হল তাঁর অপমান। তিনি কূপের ভিতরে বসে কাঁদতে লাগলেন।

এমনি সময়ে একটা ব্যাপার ঘটল। পৃথিবীতে তখন এক খুব সুন্দর, ধার্মিক আর সাহসী বীর রাজা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল মহারাজা যযাতি। যযাতি সেইদিন সেই বনে শিকার করতে এসেছিলেন। হঠাৎ তিনি কান্না শুনতে পেলেন। খুঁজতে

খুঁজতে অবশেষে তিনি হাজির হলেন সেই কূপের কাছে। ধাত্রী তো রাজাকে দেখে ভারী ভয় পেয়ে গেল। রাজা তাকে যা জিজ্ঞাসা করেন সে তার কিছুই বলতে পারেনা। তখন রাজা যযাতি কূপের মধ্যে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে! আপনি আমার এই হাত ধরুন—আমি আপনাকে কূপ থেকে উদ্ধার করে বাইরে আনছি। দেবযানী সেই কূপের ভিতর থেকে যযাতির কথা শুনলেন। তারপর যযাতির হাত ধরে বাইরে এলেন।

রাজা যযাতি কূপের মধ্য থেকে দেবযানীকে উঠে আসতে দেখে খুব অবাক হলেন। বল্লেন,—আপনি কে? আপনার মত অপরূপ সুন্দরী মেয়ে আমি আর কখনও দেখিনি। দয়া করে আপনার পরিচয় দিন। তখন দেবযানী বল্লেন,—আমি দেবযানী। দৈত্যদের কুলগুরু শুক্রাচার্য আমার পিতা। আপনি আমাকে এই কূপের থেকে উদ্ধার করেছেন। সেজন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এখন আপনার পরিচয় দিন।

রাজা বল্লেন,—আমি ক্ষত্রিয় রাজা যযাতি। যদি কখনও আপনার দরকার হয়, আমাকে খবর দিলেই আমি আপনার কাছে আসব।

যযাতি চলে গেলেন। দেবযানীও তার দাসীকে নিয়ে অসুর-পুরের কাছে এলেন। কিন্তু তিনি পুরীর ভিতরে প্রবেশ করলেন না। তাঁর দাসীকে শুক্রাচার্যের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে প্রায় সন্ধ্যা হয়। সারাদিন শুক্রাচার্য তাঁর মেয়ের কোনও খবর পাননি। তিনি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এমন সময়ে দাসী এল সেখানে। তাকে দেখেই শুক্র তাড়াতাড়ি গিয়ে

জিজ্ঞাসা করলেন। দেবযানী কোথায়? বহুক্ষণ আমি তাকে দেখিনি।

তখন দাসী কাঁদতে কাঁদতে বল্ল,—হে দৈত্যকুলগুরু, দেবযানী আর এই অসুরপুরের মধ্যে আসবেন না। তিনি বাইরে ব'সে আছেন। আপনাকে সংবাদ দিতে বলেছেন।

শুক্রাচার্য এই সংবাদ শুনে তাড়াতাড়ি দেবযানীর কাছে এলেন। দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করলেন—মা! তোমার কিসের দুঃখ? কেন তুমি অসুরপুরী ত্যাগ করে এসেছ? তখন দেবযানী বল্লেন,—বাবা! বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা আমাকে অপমান করেছে। সে আমাকে কূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

শুক্রাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন,—শর্মিষ্ঠা কেন তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করল?

দেবযানী তখন সমস্ত ঘটনা বল্লেন। শেষে কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন,—বাবা, শর্মিষ্ঠা শাস্তি না পেলে আমি কিছুতেই এখানে থাকব না।

শুক্রাচার্য খুব ভাবনার মধ্যে পড়লেন। দেবযানী তাঁর একটি মাত্র মেয়ে। তাকে তিনি খুব বেশী ভালবাসেন। তিনি উপায় ভাবতে লাগলেন। শেষে বল্লেন,—মা, তুমি শর্মিষ্ঠাকে ক্ষমা কর। সে অজ্ঞান, নির্বোধ। কিছুই জানে না। ভালমন্দ জ্ঞান নেই। তুমি আমার কাছে শাস্ত্র পড়েছ। তুমি জান ক্ষমা করার মত মহৎ কাজ আর কিছুই নেই।

কিন্তু দেবযানীর মন কিছুতেই শান্ত হল না। সে বেচারীর দোষই বা কি? কূপের মধ্যে পড়ে গিয়ে তার যেমন ব্যথা লেগেছে তেমন অপমানও হয়েছে। সে বল্ল,—বাবা! আপনি

৪

দৈত্যপুরে ফিরে যান। আমি আর যাব না। এই অপমানের পর আমার মৃত্যুই ভাল। আমি আর বাঁচতে চাই না।

একথা শুনে শুক্রাচার্য খুব ভয় পেলেন। দেবযানী না বাঁচলে তিনি আর বেঁচে কি করবেন? কাজেই দেবযানীকে বল্লেন,—মা, তুমি শান্ত হও। আমি এখনই বৃষপর্বার কাছে যাচ্ছি।

শুক্রাচার্য বৃষপর্বার কাছে গেলেন। তাঁকে দেখেই অসুররাজ তাড়াতাড়ি তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন,—গুরুদেব, এই অসময়ে আপনি কেন এসেছেন? আপনার মঙ্গল তো?

শুক্রাচার্য বল্লেন,—বৃষপর্বা, তোমার মেয়ে শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে অপমান করেছে। বনের মধ্যে কূপের ভিতরে ফেলে দিয়েছে। দেবযানী বলেছে সে আর এই রাজ্যে থাকিবে না। সে আমার একমাত্র কন্যা। সে যেখানে যাবে আমিও সেখানেই যাব। কাজেই আমি এখনই অসুর রাজ্য ছেড়ে চলে যাব।

শুক্রাচার্যের কথা শুনে তো অসুররাজের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কি সর্বনাশ! দৈত্যগুরু চলে গেলে অসুরদের কে রক্ষা করবে? দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে যখন অসুররা মারা যাবে কে তাদের বাঁচিয়ে তুলবে? দেবতারা যেই শুনতে পাবেন যে অসুররাজ্য ছেড়ে শুক্রাচার্য চলে গেছেন, তখনই তাঁরা আসবেন যুদ্ধ করতে। আর সে যুদ্ধে বৃষপর্বা কেমন করে জয়লাভ করবেন? ভয়ে বৃষপর্বার মুখ শুকিয়ে গেল। শুক্রাচার্যের পা জড়িয়ে ধরে বল্লেন,—গুরুদেব রক্ষা করুন। আপনি আমাদের ত্যাগ করবেন না। তাহলে সমস্ত অসুর জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনি দয়া করে বলুন কি করলে আপনি থাকবেন।

তখন শুক্র বল্লেন,—তবে তুমি দেবযানীকে শান্ত কর। সে যদি অসুরপুরে থাকতে রাজী হয় তবে আমারও থাকতে কোনও আপত্তি নেই।

তখন বৃষপর্বা দেবযানীর কাছে গিয়ে বল্লেন,—মা,আমার কন্যা শর্মিষ্ঠা তোমাকে অপমান করেছে। তার জন্য আমি তোমার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করছি। শর্মিষ্ঠা নির্বোধ। সে কিছুই জানে না। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর তবে অসুরজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। তুমি আমাকে বল কি পেলে তুমি খুসী হবে।

তখন দেবযানী বল্লেন,—অসুররাজ, শর্মিষ্ঠা যদি আমার দাসী হয় তবেই আমি খুসী হই।

বৃষপর্বা বল্লেন,—তাই হবে মা। আমি এখনই শর্মিষ্ঠাকে সংবাদ পাঠাচ্ছি।

শর্মিষ্ঠার কাছে এই সংবাদ গেল। তিনি বুঝতে পারলেন যে চিরকালের জন্য তিনি দেবযানীর দাসী হলেন। কিন্তু উপায় নেই। তিনি দাসী না হলে দেবযানী খুসী হবেন না। আর তাহলে শুক্রাচার্য দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। তার মানে অসুর-জাতি দেবতাদের কাছে হেরে যাবে। কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না। শর্মিষ্ঠা খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি তখনই দেবযানীর কাছে এলেন। মাথা নীচু করে, খুব বিনয়ের সঙ্গে বল্লেন,—দেবযানী, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি প্রসন্ন হও। তোমার পিতা প্রসন্ন হ'ন। তোমরা আমাদের পরিত্যাগ করো না। আমি আজ থেকে চিরকালের জন্য তোমার দাসী হয়ে থাকবো।

দেবযানী এতক্ষণে খুসী হলেন। তাঁর অপমানের জ্বালা

এইবার কম্‌ল। তিনি তাঁর পিতাকে নিয়ে অসুররাজপুরীতে প্রবেশ করলেন। শর্মিষ্ঠা রইলেন তাঁর কাছে তাঁর দাসী হয়ে।

এর পরে অনেকদিন কেটে গেছে। শর্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসী হয়েই আছেন। দেবযানী যেখানে যান শর্মিষ্ঠা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। তাঁর সমস্ত আদেশ মেনে চলেন। দেবযানীকে নিজের হাতে সাজিয়ে দেন।

এর মধ্যে একদিন দেবযানী শর্মিষ্ঠা আর অন্য সখীদের নিয়ে সেই নদীতীরের বনে বেড়াতে গেলেন। সেখানে সেদিন মহারাজ যযাতিও এসেছিলেন। যযাতি যখন সেদিন আবার দেবযানীকে দেখতে পেলেন, তখন বল্লেন,—দেবযানী, আমি তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আমি প্রার্থনা করি তুমি আমাকে বিবাহ কর।

দেবযানীও রাজা যযাতিকে সেই প্রথম দিনেই ভালবেসে-ছিলেন। তাঁর নিজের কোনই আপত্তি ছিল না। তিনি যযাতিকে বল্লেন—মহারাজ, আপনি আমার পিতা শুক্রাচার্যকে বলুন।

শুক্রাচার্য যখন শুনলেন যে মহারাজা যযাতি দেবযানীকে বিবাহ করতে চেয়েছেন তখন তিনি খুব খুসী হলেন। দেবযানী ও যযাতির বিয়ে হল। শর্মিষ্ঠা নিজের হাতে দেবযানীকে সাজিয়ে দিলেন। দুঃখিনী শর্মিষ্ঠাও যাবেন দেবযানীর সঙ্গে। কারণ তিনি তো দাসী। শর্মিষ্ঠা মনে মনে ভাবলেন কি অদৃস্ট। আমি রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা। আমার কোনও দিনই বিয়ে হবে না কোনও রাজার সঙ্গে। চিরকালই দেবযানীর দাসী হয়ে কাটবে আমার জীবন।

যাবার সময়ে শুক্রাচার্য যযাতিকে বল্লেন,—রাজা! আমার এই

কন্যা আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী। তুমি একে আদর করবে, সম্মান করবে। কখনও যেন ইনি দুঃখ না পান।

দেবযানী পরম সুখে দিন কাটান। মহারাজ যযাতি তাঁকে ইন্দ্রের প্রাসাদের মত বাড়ী তৈরী করে দিয়েছেন। কিছুদিন পরে দেবযানীর একটি ছেলে হল। সুন্দর রূপবান্ ছেলে। দেবযানীর মনে এখন আর কোনই দুঃখ নেই।

এদিকে শর্মিষ্ঠাও আছেন এক আলাদা বাড়ীতে, তাঁর দাসীদের নিয়ে। সে বাড়ীটি আবার রাজবাড়ী থেকে অনেক দূরে। অশোক কাননে। তখনকার দিনে সব রাজাই একটি করে অশোক কানন তৈরী করতেন। সেখানে নানারকম সুন্দর সুন্দর ফুল-ফল, বাহারে লতার গাছ থাকত। ঝরণা থাকত, নানা রকম রঙীন পাখী আর হরিণ ঘুরে বেড়াত অশোক কাননে।

রাজবাড়ী থেকে অনেক দূরে বলেই দেবযানী শর্মিষ্ঠাকে এখানে রেখেছিলেন। একদিন রাজা যযাতি একা একাই এসেছেন অশোক কাননে বেড়াতে। হঠাৎ তিনি দেখলেন ঝরণার ধারে একটি সুন্দরী মেয়ে বসে কাঁদছেন। রাজা খুবই অবাক হলেন। তিনি তো আর শর্মিষ্ঠাকে দেখেননি। শর্মিষ্ঠা কাঁদছেন দেখে রাজার খুব কষ্ট হল। তিনি ধীরে ধীরে তাঁর পাশে এসে জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি কে ? তুমি কাঁদছই বা কেন ? শর্মিষ্ঠা চমকে তাকালেন। দেখলেন মহারাজ যযাতি তাঁর সম্মুখে। তিনি নমস্কার করে বল্লেন,—মহারাজ ! আমি মহারাণী দেবযানীর দাসী শর্মিষ্ঠা।

রাজা বল্লেন,—তুমি দাসী ? কিন্তু তোমাকে দেখে তো তা'

মনে হয় না। মনে হয় তুমি কোনও দেশের রাজকন্যা। সত্য করে বল তুমি কে ?

তখন শর্মিষ্ঠা ধীরে ধীরে সব কথাই রাজাকে খুলে বল্লেন। শুনে রাজার খুব দুঃখ হল। আহা! রাজকন্যার এ কী দশা! কিন্তু দেবযানীকে রাজা খুব ভয় করতেন, সেজন্য তাকে কিছু বলতে তাঁর সাহস হল না।

এরপর থেকে রাজা প্রায়ই আসতেন অশোক বনে। শর্মিষ্ঠার সঙ্গে গল্প করতেন। তাকে সান্ত্বনা দিতেন। এমনি করে শেষে দুজনে দুজনকে ভালবেসে ফেল্লেন। তারপর রাজা যযাতি গোপনে শর্মিষ্ঠাকে বিয়ে করলেন। শর্মিষ্ঠা তাঁর দুঃখ ভুলে গেলেন। দেবযানী কিন্তু এসব কিছুই জানতে পারলেন না। তিনি তো অশোক বনে আসতেন না।

অনেকদিন কেটে গেল। দেবযানীর দুটি ছেলে হয়েছে। শর্মিষ্ঠার তিনটি ছেলে। রাজা যখন অশোকবনে যান তখন শর্মিষ্ঠার ছেলে তিনটিকে আদর করেন, ভালবাসেন। কিন্তু সবই খুব সাবধানে করতে হয়। দেবযানী জানতে পারলে আর রক্ষা নেই।

হঠাৎ একদিন দেবযানীর ইচ্ছা হল অশোকবনে যাবার। তাঁর মনে হল আহা বেচারী শর্মিষ্ঠার কোনই খোঁজ তিনি নেননি এতদিনের মধ্যে। এটা তাঁর খুবই অন্যায় হয়েছে। তিনি অশোকবনে এলেন। রাজার কিন্তু একটুও আসবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দেবযানী তাঁর কথা শুনলেন না।

তখন ফাল্গুন মাস। অশোক কানন ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে। অশোক ফুটেছে, গন্ধরাজ, যূঁই, চামেলী ফুটেছে।

হাজার রকম চাঁপা, গোলাপ আর পদ্মফুলে অশোককানন ভরে গেছে। দেবযানী ঘুরে বেড়াচ্ছেন বনের মধ্যে। হঠাৎ দেখতে পেলেন দেবশিশুর মত তিনটি সুন্দর ছোট ছেলে খেলে বেড়াচ্ছে। রাজপুত্রের মত সাজপোষাক। গায়ের রংএ যেন বন আলো হয়ে গেছে।

ওদের দেখে দেবযানী খুব অবাক হলেন। এরা কে? কোথা থেকে এল? রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—মহারাজ, এই বনের মধ্যে এরা কে?

রাজা কোনও কথা বলতে পারলেন না। চুপ করে রইলেন। দেবযানী তখন ঐ শিশুদের ডাকলেন। তারা রাজাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এল। দেবযানী তাদের আদর করে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কে? কার ছেলে তোমরা? বালক তিনটি রাজাকে দেখিয়ে বল্ল,—মহারাজ যযাতি আমাদের পিতা, বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা আমাদের মা।

দেবযানী যযাতির দিকে চাইলেন। যযাতি মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। দেবযানী বুঝলেন ছেলেরা সত্যকথাই বলেছে। ঘৃণায় অপমানে দেবযানী কাঁপতে লাগলেন। বল্লেন,—তুমি মিথ্যাবাদী, ঠক, তুমি আমাকে মিথ্যাকথা বলে ঠকিয়েছ। আমি আর তোমার কাছে থাকব না। এই মুহূর্তেই আমি আমার বাবার কাছে চলে যাব। রাজাকে একা ফেলে রেখে দেবযানী চলে গেলেন। তাঁর নিজের ছেলেদের সঙ্গেও দেখা করলেন না একবার। যযাতিও ভয়ে ভয়ে তাঁকে সঙ্গে করে অসুরপুরে দিয়ে এলেন।

শুক্রাচার্য দেখলেন দেবযানী কাঁদছেন। অত্যন্ত দুঃখিত

হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—মা তুমি কাঁদছ কেন ? তোমার ছেলেরা ভাল আছে তো ? মহারাজ যযাতির কুশল তো ?

দেবযানী বল্লেন,—পিতা, আমার ছেলেরা ভালই আছে। কিন্তু আমার স্বামী যযাতি আমাকে অপমান করেছেন। তিনি আমার দাসী শর্মিষ্ঠাকে গোপনে বিবাহ করেছেন।

এই কথা শুনে শুক্রাচার্য ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি রাজাকে বল্লেন,—তুমি আমার কন্যাকে অপমান করেছ। তোমার প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গেছ। তোমাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি। তোমার এই সুন্দর রূপ ও যৌবন আর থাকবে না। তুমি এই মুহূর্ত থেকে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ হয়ে যাবে। তোমার দেহ জরার ভারে নুয়ে আসবে। তুমি অন্ধ হয়ে যাবে।

কি আশ্চর্য ! শুক্রাচার্য এই কথা উচ্চারণ করতে করতেই মহারাজ যযাতির অমন দেবতার মত রূপ নষ্ট হয়ে গেল। তাঁর চুলগুলো ঠিক শণের মত সাদা হয়ে গেল। গায়ের চামড়া ঝুলে পড়ল। তাঁর সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। মহারাজ যযাতিকে জরা এসে আক্রমণ করল। মহারাজ অন্ধ হয়ে গেলেন। কাতরভাবে তিনি শুক্রের দয়া ভিক্ষা করতে লাগলেন।

অনেক অনুনয় বিনয়ের পরে শুক্রাচার্য বল্লেন,—রাজা ! আমার কথা মিথ্যা হয় না। তবে যদি কেউ নিজের ইচ্ছায় তোমার জরা গ্রহণ করে এবং তার নিজের রূপ ও যৌবন তোমাকে দান করে, তা হলে তুমি আবার তোমার পূর্বরূপ ফিরে পাবে।

রাজা যযাতি বল্লেন,—আমার পাঁচটি পুত্র আছে। তাদের

মধ্যে একজন নিশ্চয়ই আমার এই জরা নিতে রাজা হবে। হে দৈত্যকুলগুরু, আপনি অনুমতি দিন, আমার যে পুত্র আমার জরা গ্রহণ করবে আমি তাকেই আমার রাজ্য ও সিংহাসন দান করব।

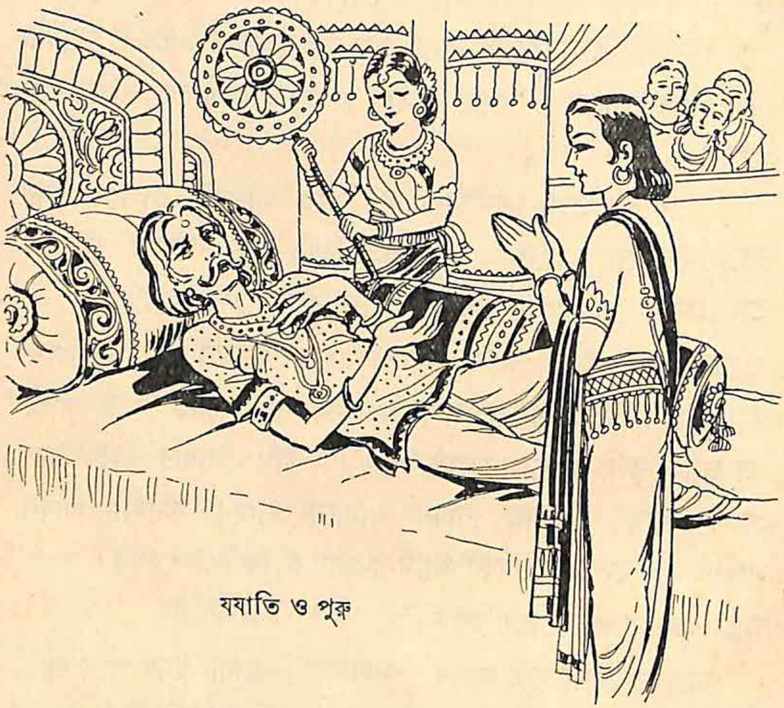
শুক্রাচার্য তাতে রাজী হলেন। বল্লেন,—রাজন্! তোমার যে পুত্র তোমাকে তার রূপ ও যৌবন দান করবে এবং তোমার জরা ও ব্যাধিকে নিজের দেহে গ্রহণ করবে তুমি তাকেই তোমার রাজ্য দান কোরো। কারণ সেই তোমার সর্বাপেক্ষা পিতৃভক্ত পুত্র।

তখন জরাপ্রাপ্ত যযাতি থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর রাজ্যে ফিরে এলেন। তারপর তিনি তাঁর পাঁচটি ছেলেকে ডাকলেন। প্রথমে যযাতি দেবযানীর বড় পুত্রকে বল্লেন,—পুত্র, শুক্রের অভিশাপে আমি আমার যৌবন হারিয়েছি। জরাগ্রস্ত হয়েছি। কিন্তু এখনও আমার জীবনের অনেক কাজ বাকী আছে। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তুমি আমার এই জরা গ্রহণ কর। তোমার যৌবন আমাকে দাও। আমার জীবন সম্পূর্ণ হলে তোমার যৌবন আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব। তখন আমি আমার জরা ভোগ করব।

যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র বল্লেন,—মহারাজ! জরার ন্যায় পাপ আর কিছুই নেই। জরায় মানুষের কোনও সুখ নেই। তার দেহ কুৎসিত হয়। বাহু বলহীন হয়। চোখ অন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং পিতা, আমি আপনার জরা নিতে পারব না। আপনি আপনার অন্য পুত্রদের জিজ্ঞাসা করুন।

যযাতি বল্লেন,—তুমি আমার রাজ্য বা সিংহাসন কিছুই পাবে না। তুমি আমার সম্মুখ হতে দূর হও।

এইভাবে রাজা যযাতি দেবযানীর আর এক পুত্র এবং শর্মিষ্ঠার দুই পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু তারা কেউই রাজার জরা নিতে রাজী হল না। রাজা ক্রোধে তাদের প্রত্যেককেই অভিশাপ দিলেন।



যযাতি ও পুরু

অবশেষে শর্মিষ্ঠার সবচেয়ে ছোট ছেলে পুরু এলেন পিতার কাছে।

রাজা তাঁকে বল্লেন,—পুরু। তুমি আমার সবচেয়ে ছোট ছেলে। সেজন্য তোমাকে আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। শুক্রের শাপে আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। কিন্তু আমার জীবনের

সুখ-আনন্দ কিছুই ভোগ করা শেষ হয়নি। সেজন্য তোমাকে অনুরোধ করি তুমি নিজের ইচ্ছায় তোমার বয়স, যৌবন, এবং রূপ আমাকে দান কর।

তখন পুরু বল্লেন,—পিতা আপনি সুখী হউন। এই মুহূর্ত থেকে আমি আপনার জরা গ্রহণ করছি। আপনি যা আদেশ করবেন, আমি সন্তুষ্ট মনে তাই করব। আপনি পিতা। পিতা এবং দেবতাতে কোনও পার্থক্য নাই। পিতা দেবতা হতেও শ্রেষ্ঠ। হে রাজন্! আপনি আমার রূপ, যৌবন সমস্তই গ্রহণ করুন। কারণ এ সমস্তই আপনারই সৃষ্টি। আপনি আপনার ইচ্ছামত জীবনকে ভোগ করুন। আপনার অভিশাপ আমি নিজের দেহে নিলাম।

যযাতি এই কথা শুনে বল্লেন,—পুরু, তোমাকে আমি আমার এই রাজ্য ও সিংহাসন দিলাম। আমার মৃত্যুর পরে তুমি এ দেশের রাজা হবে। পৃথিবীতে তোমার এই অপূর্ব পিতৃভক্তির জন্য তুমি অমর হয়ে থাকবে। তোমার পুরু নাম থেকে এ বংশের নাম হবে পৌরব।

এই বলে যযাতি শুক্রকে স্মরণ করলেন। পুরুর দেহে তাঁর জরা গিয়ে আক্রমণ করল। পুত্রের সুন্দর যৌবন যযাতির দেহ আশ্রয় করল। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল পুরুর এই অসাধারণ পিতৃভক্তিতে অবাক হল। দেবতারা পুরুর মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

গুহক মিতালী

অযোধ্যার রাজা দশরথ।

হরিণ শিকারে গেছেন। সারাদিন কেটে গেছে। একটিও হরিণ পাননি। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ক্লান্ত রাজা বসে আছেন একটা ঝোপের পাশে। একটু দূরেই ঝরণা। হঠাৎ রাজা একটা শব্দ শুনতে পেলেন। কেউ যেন জল খাচ্ছে। বোধ হয় বনের কোন প্রাণী। নিশ্চয়ই হরিণ একটা। রাজা খুশী হয়ে উঠলেন। অন্ধকার হয়ে গেছে। কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু তাতে রাজার কিছু এসে যায় না। রাজার কাছে আছে একরকম আশ্চর্য তীর। তাকে বলে শব্দভেদী বাণ। শব্দভেদী অর্থাৎ শব্দকে যে ভেদ করে। ভেদ করে মানে বিঁধে। শব্দভেদী বাণের মানে হল যে বাণ দূরের কোন শব্দ শুনেই তাকে বিঁধতে পারে। তাকে চোখে দেখার দরকার হয় না।

রাজা দশরথ সোজা হয়ে উঠে বসলেন। তখনও জলের মধ্যে শব্দ হচ্ছে বুক্ বুক্ বুক্।

শব্দভেদী বাণ ছুঁড়লেন রাজা। আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই কে যেন আর্ত্তনাদ করে উঠল। চমকে উঠলেন রাজা। এতো হরিণের চীৎকার নয়। এ যেন মানুষের গলা মনে হচ্ছে। রাজা দৌড়ে এলেন। সর্ব্বনাশ! যা ভেবেছেন ঠিক তাই। হরিণ নয়। কোন্ এক মুনিপুত্র জল ভরতে এসেছিল। তার হাতের জলভরা কলসী পড়ে আছে, মুনির ছেলে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। রক্তে মাটি ভিজে গেছে। দশরথ দেখে বসে

পড়লেন তার পাশে। মুনিপুত্র ধীরে ধীরে বল্ল,—রাজা, তুমি আমাকে মারলে কেন ? আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি। আমার নাম সিন্ধু। আমি অন্ধমুনির ছেলে। আমার বাবা চোখে কিছুই দেখতে পান না। আমার মাও সেজন্য তাঁর নিজের চোখ কেটে ফেলেছেন। আমিই তাঁদের দেখাশোনা করি। আজ থেকে কে তাঁদের দেখবে জানিনা।

সিন্ধু এই কথা বলে মারা গেল।

দশরথ অনেকক্ষণ সেখানে বসে রইলেন চুপ করে। তারপর ধীরে ধীরে সিন্ধুর মৃতদেহ নিয়ে গেলেন অন্ধমুনির আশ্রমে। সেখানে অন্ধমুনি আর তাঁর স্ত্রী বসে আছেন। তাঁদের সমস্ত মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সিন্ধু সেই কখন জল আনতে গেছে। এখনও জল নিয়ে এলো না কেন ?

এর মধ্যে বনের শুকনো পাতায় মড়্ মড়্ শব্দ হল। অন্ধ-মুনি ভাবলেন সিন্ধু আসছে। তিনি ব্যাকুল হয়ে সিন্ধুকে ডাকতে লাগলেন।

কিন্তু সিন্ধু তো নয়। রাজা দশরথ আসছেন সিন্ধুর মৃতদেহ নিয়ে।

রাজা এসে আস্তে সিন্ধুর মৃতদেহ রাখলেন আশ্রমের দাওয়ায়। তারপর ধীরে ধীরে অন্ধমুনিকে সব কথা খুলে বল্লেন,—অন্ধমুনির শোকের আর সীমা রইল না। তিনি দশরথকে বল্লেন,—রাজা পুত্রশোক কি তুমি তা জানন। কারণ তুমি অপুত্রক। তোমার পুত্র নেই। আমি তোমাকে অভিশাপ দেব। আমার যেমন আজ পুত্রশোকে মৃত্যু ঘটল, তেমনি তুমিও পুত্রশোকে মারা যাবে। নারায়ণ নিজে তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবেন।

তোমার চারিটি পুত্র হবে। শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। তাঁর শোকে তোমার মৃত্যু ঘটবে।

এই বলে অন্ধমুনি আর তাঁর স্ত্রী পুত্রশোকে প্রাণ হারালেন। দশরথ মাথা নীচু করে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। মনের মধ্যে সারাক্ষণই তাঁর অনুতাপ হচ্ছে। ব্রাহ্মণ পুত্রকে হত্যা করেছেন। সে জন্য ব্রহ্মহত্যার পাপ তাঁর হয়েছে। সে কি সোজা পাপ ?

দশরথ ভেবে ভেবে শেষে ঠিক করলেন এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের আশ্রমে এলেন তিনি। কিন্তু এসে শুনলেন বশিষ্ঠ আশ্রমে নেই। তপস্যায় গেছেন। বশিষ্ঠের পুত্র বামদেব ছিলেন আশ্রমে। তিনি তাড়াতাড়ি দশরথকে আদর যত্ন করে বসালেন। কেন দশরথ এসেছেন আশ্রমে সে কথা জিজ্ঞাসা করলেন। দশরথ বল্লেন,—না জেনে আমি ব্রহ্মহত্যা করেছি। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ?

বামদেব তাঁকে শান্ত করে বল্লেন,—রাজন্ না জেনে যে পাপ করেছেন তার জন্য আপনি এত দুঃখিত হবেন না আমি আপনার ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দিচ্ছি। শীঘ্রই নারায়ণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন। চারি অংশে বিভক্ত হবেন তিনি। সেই চারজনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যিনি তিনি শ্রীরামচন্দ্র। আপনি তিনবার শ্রীরামের নাম উচ্চারণ করুন, আপনার সমস্ত পাপ খণ্ডন হয়ে যাবে।

এইকথা শুনে দশরথ তিনবার রামনাম জপ করলেন। আর কি আশ্চর্য ! রাজার মন শান্তিতে পূর্ণ হয়ে গেল। প্রসন্ন মনে রাজা রাজ্যে ফিরে গেলেন।

সন্ধ্যার পর আশ্রমে ফিরলেন বশিষ্ঠ।

পা ধোবার জল এগিয়ে দিলেন বামদেব।

বশিষ্ঠ পা ধুলেন। সন্ধ্যা-আহ্নিক করলেন। তারপর বামদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন সারাদিনের খবর।

বামদেম বল্লেন,—পিতা, মহারাজ দশরথ এসেছিলেন আজ। বনের মধ্যে না জেনে তিনি অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুকে হত্যা করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য তিনি এসেছিলেন। বশিষ্ঠ জিজ্ঞাসা করলেন,—কি প্রায়শ্চিত্ত তুমি তাকে দিয়ে করালে, পুত্র ?

বামদেব বল্লেন,—পিতা, মহারাজ দশরথকে দিয়ে আমি তিনবার রামনাম বলিয়েছি।

বশিষ্ঠ বল্লেন,—পুত্র, তুমি অন্যায় এবং অশাস্ত্রীয় কাজ করেছ। রামনাম একবার মাত্র উচ্চারণ করলেই মানুষের সমস্ত পাপ কেটে যায়। তুমি রাজাকে দিয়ে কেন তিনবার রামনাম বলালে ? এই কাজের ফলে রামনামের মর্য্যাদা তুমি নষ্ট করেছ। এতে তোমার অত্যন্ত পাপ হয়েছে। এবং সে পাপের শাস্তি তোমাকে নিতে হবে।

বামদেব কাতর হয়ে বল্লেন,—কিন্তু পিতা, আমি না জেনে এ কাজ করেছি, আমাকে মার্জনা করুন।

বশিষ্ঠ বল্লেন,—আমি মার্জনা করতে পারি না। তুমি ব্রাহ্মণের পুত্র, নিজে শাস্ত্রপাঠ করেছ। সেই শাস্ত্রের বিরোধী কাজ করার শাস্তি তোমাকে নিতেই হবে।

বামদেব ব্যাকুল হয়ে বল্লেন,—পিতা, কি সেই শাস্তি ? আপনি বলুন।

বশিষ্ঠ গম্ভীর স্বরে বল্লেন,—বামদেব, এই পাপে তোমার চণ্ডাল জন্ম হবে।

বামদেব বশিষ্ঠের পা জড়িয়ে ধরে বল্লেন,—পিতা, এ পাপ থেকে কবে আমার মুক্তি হবে ?

বশিষ্ঠ বল্লেন,—রামচন্দ্র আসবেন দশরথের পুত্র হয়ে। তাঁকে দর্শন করলে তবে তোমার চণ্ডাল জন্ম থেকে মুক্তি হবে।

বামদেবের নতুন জন্ম হল চণ্ডালপাড়ায়। চণ্ডালসর্দারের ছেলে হলেন বামদেব। নাম হল গুহক। যেমন রূপ তেমনই গুণ। চণ্ডালপাড়ায় এমন ছেলে কোথা থেকে এল কে জানে ? চণ্ডালের ঘর। পড়াশুনার বালাই নেই। শিখতে হবে তীর ধনুকের খেলা। সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়ায় গুহক। আর তীর ধনুক শেখে। দেখতে দেখতে অব্যর্থ লক্ষ্য হয়ে উঠল তার। অমন সাহসা, অমন বীর চণ্ডাল পাড়ায় আর কেউ নেই।

গুহকের বাপ চণ্ডালসর্দারের মৃত্যু হল। নতুন সর্দ্দার হ'ল গুহক। সে বাঁশের মাচার উপর বসল। পাখায় পালকের মুকুট-পরা মাথায় গুহকের অভিষেক হল। চণ্ডাল পাড়ার সবাই নিয়ে এল মধু আর পাখীর মাংস। উৎসব হল তাই দিয়ে। গোটা চণ্ডাল পল্লী জুড়ে মহাভোজ হল।

দিন কাটে গুহকের পাখী শিকার করে, শূয়োর চরিয়ে আর অন্যান্য ছোট সব কাজের মধ্য দিয়ে।

এমনই সময়ে একদিন মহারাজ দশরথ যাচ্ছেন গঙ্গাস্নানে। সঙ্গে তাঁর চার ছেলে। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। চাঁদের মত ছেলে। মহা আনন্দে চলেছেন রাজা। আগে পিছে সৈন্যদল, মহা কোলাহল করতে করতে চলেছে।

পথে পড়ল চণ্ডাল পল্লী। ছোট ছোট তালপাতা আর খড়ের

ছাউনী দেওয়া ঘর। গরীবের ছুঃখে কষ্টে গড়া। উঠোনের পাশে পাশে পশু রাখবার খোঁয়াড়। কোথাও বা ধানের মরাই। হাঁস মুরগী ঘুরে বেড়াচ্ছে এধার ওধার। রাজা দশরথের সৈন্যদল সেই চণ্ডালপল্লীর উপর দিয়ে পথ করে চলল। ছোট ছোট ঘর-গুলো ভেঙ্গে গেল। ভয় পেয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কাঁদতে লাগল। মেয়েরা লুকিয়ে পড়ল এদিক ওদিক। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সে এক বিষম ব্যাপার।

খবর পৌঁছল গুহকের কাছে। রাজা দশরথের সৈন্যরা চণ্ডাল পল্লীকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ভেঙ্গে দিয়ে চলে যাচ্ছে। গুহক তক্ষুণি লাফিয়ে উঠল। এমন অন্যায় সে কিছুতেই সহ্য করবে না। তার ধনুক বাগিয়ে নিয়ে ছুটে এল গুহক। সঙ্গে এল চণ্ডালপাড়ার ছেলেরা। রুখে দাঁড়াল তারা। দশরথকে ডেকে বল্ল,—এ কি ব্যবহার রাজার ? হলই বা তারা ছোট জাত। তাই বলে কি তারা বাঁচতে পারে না ? কি অপরাধ তারা করেছে রাজার কাছে ?

দশরথ গ্রাহ্য করলেন না ছোট নীচ জাতের কথাকে। গুহক তীর ছুঁড়ল। দশরথও তাঁর তীর ধনুক টেনে নিলেন। ছুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ।

কিন্তু কিশোর গুহক পারবে কেন দশরথের মত বীরের সঙ্গে। রাজা দশরথ এক আশ্চর্য্য তীর ছুঁড়লেন। সে তীর ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুহকের হাতে নাগপাশের বন্ধন পড়ল। রাজার আদেশে বন্দী গুহককে রথে তোলা হল। গুহক ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ মনে হল হাতছুটোই না হয় বাঁধা পড়েছে। পা ছুখানা তো এখনও খোলাই আছে। তিনি পায়ে ধনুকে

গুণ টেনে তীর ছুঁড়লেন। এই অদ্ভূত ব্যাপার দেখে সবাই অবাক। রামচন্দ্র ছিলেন অন্য রথে ভাইদের সঙ্গে। তাঁর কানে এসে পৌঁছল এ কথা। এই আশ্চর্য বীর কিশোরকে দেখবার জন্য তাঁরা এলেন দশরথের রথে।

রামচন্দ্র দেখলেন গুহককে। গুহক দেখলেন রামচন্দ্রকে।

দুজনেরই মনে হল একে তো চিনি। গুহকের মনে হল জন্ম জন্ম ধরে যেন এঁর জন্যই তিনি বসে ছিলেন। ধীরে ধীরে মনে হল তাঁর পূর্ব্বজন্মের কাহিনী। বশিষ্ঠমিত্র বামদেব তিনি। রামনামের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করেছিলেন। সেই অপরাধে চণ্ডাল জন্ম। মনে পড়ল বশিষ্ঠের কথা। রামদর্শনে তাঁর পাপক্ষয় হবে। এই তো সেই রাম। তবে তো আর কোন চিন্তা নেই। আনন্দে গুহকের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

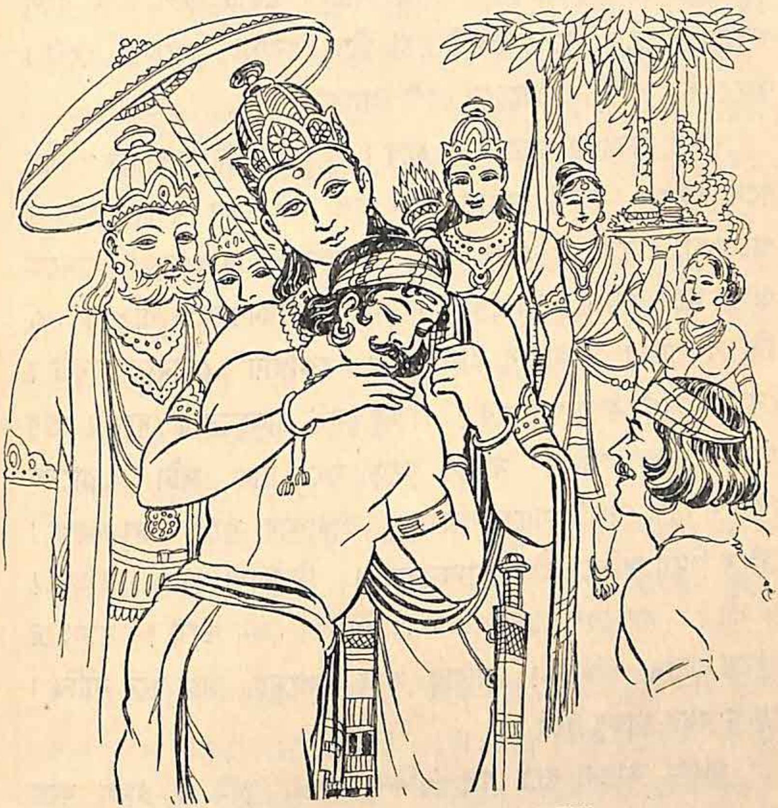
রামচন্দ্র এসে বসলেন গুহকের পাশে। ধীরে ধীরে তাঁর গায়ে হাত দিলেন। আশ্চর্য্য। গুহকের হাতের বাঁধন খুলে গেল। সে দুহাতে রামচন্দ্রের পাদুখানি জড়িয়ে ধরল। রামচন্দ্র তাকে তুলে ধরলেন। জড়িয়ে ধরলেন বুকের মাঝে। সবাই অবাক। রাজপুত্র রাম অস্পৃশ্য চণ্ডালকে আলিঙ্গন করছেন। রামচন্দ্র গুহককে বল্লেন,—গুহক! আজ থেকে তুমি আমার মিতা আমার বন্ধু।

গুহক আকুল হয়ে বলে উঠল,—আর তুমি। তুমি আমার কে?

রামচন্দ্র মধুর হেসে বল্লেন,—আমিও তোমার মিতা।

গুহক রামচন্দ্রকে নিয়ে গেল তার পল্লীতে। নিয়ে এল মধু আর মাংস। সারাদিন ধরে চলল উৎসব আর আনন্দ। নারায়ণ মিতালী করলেন চণ্ডালের সঙ্গে।

কতদিন কত বছর কেটে গেছে। গুহক চণ্ডাল প্রতীক্ষায় আছে রামচন্দ্রের। কতদিন তাকে সে দেখেনি। সেই শ্যামল, সুন্দর, কিশোর রাম। ঠিক এমনি এক দিন দূত নিয়ে এল



নারায়ণ মিতালী করলেন চণ্ডালের সঙ্গে

এক শুভ সংবাদ। রামচন্দ্র জানিয়েছেন তাঁর মিতাকে পিতা দশরথ তাঁকে সিংহাসনে বসাবেন স্থির করেছেন, তাঁর অভিষেক। আর সে অভিষেকে রামচন্দ্র জানিয়েছেন গুহককে যেতেই হবে।

তখনই সাজ সাজ রব পড়ে গেল চণ্ডাল পল্লীতে। কোথায়

কি ভাল জিনিষ আছে নিয়ে চল অযোধ্যায়। চাক ভাঙ্গা পদ্মমধু আর গুহকের মায়ের হাতে গড়া পিঠে বড় ভালবাসেন রঘুমণি। সে সব জিনিষ দিয়ে যাওয়া চাই। পতিতকে উদ্ধার করার জন্য এসেছেন নারায়ণ। সমাজ যাদের ছোট বলে, নীচ বলে সরিয়ে দিয়েছে তাঁদের জন্যই তো তাঁর করুণা সবচেয়ে বেশী। তাদেরই তো তিনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন।

রাত্রি প্রভাতে যাত্রা সুরু হবে। চণ্ডাল পল্লী সারারাত জেগে বসে রইল। কিন্তু সকাল যখন হল তখন সব বদলে গেছে। অযোধ্যা থেকে রথ এসে থামল গুহকের পল্লীর কাছে। চমকে গুহক ছুটে এল। রথ থেকে নামল রাম লক্ষ্মণ আর সীতা। এ কি ব্যাপার? কোথায় রাজবেশ? কোথায় সোনার মুকুট? কোথায় মণিমুক্তার অলঙ্কার? কিছু নেই রামচন্দ্রের দেহে। শুধু গাছের বাকল পরা। মাথায় চূড়ো করে বাঁধা জটা। রামের পিছনে ঠিক তেমনি সাজে লক্ষ্মণ। হাহাকার করে উঠল গুহক। কেঁদে গিয়ে জড়িয়ে ধরল রামচন্দ্রকে। জিজ্ঞাসা করল,—মিতা! এ কী? রাজবেশ ছেড়ে এমন যোগীবেশ কেন ভাই? রামচন্দ্র হেসে বল্লেন,—মিতা! বাবার সত্য পালনের জন্য বনে যাচ্ছি। চৌদ্দ বছর থাকব বনে!

গুহক আকুল হয়ে বল্ল,—কিন্তু মিতা, তুমি না রাজা হবে অযোধ্যার?

রামচন্দ্র বল্লেন,—না মিতা! বাবা সত্য করেছেন ভরত সিংহাসন পাবে চৌদ্দ বছরের জন্য। আর আমি যাব বনে।

গুহক রেগে উঠল,—থাক তোর অযোধ্যা পড়ে। অযোধ্যার সিংহাসনে বসে তোর কাজ নেই। তুই হবি আমাদের রাজা।

বনফুলের মালা পরাব তোর গলায় ; মাথায় দেব পালকের মুকুট। চাক ভাঙ্গা পদ্মমধু খাবি তুই আর খাবি পদ্মবীজের খই। তুই থাক্ আমার দেশে। লাখো চণ্ডাল তোর ডাকে প্রাণ দেবে।

রামচন্দ্র হাসলেন,—না মিতা। তা হয় না। পিতৃসত্য পালন হবে না তাহলে। আমাকে চৌদ্দ বছর বনে যেতে হবেই। ব্রহ্মচারীর মত ফলমূল খেয়ে দিন কাটবে আমার। রাজ্যসুখ ভোগ করা আমার তো চলবে না ভাই। তাহলে সত্যপালন করা চলবে না।

গুহক চুপ করে চেয়ে রইল রামচন্দ্রের দিকে। চোখ দিয়ে তার কেবলই জল ঝরে পড়তে লাগল। তার প্রাণের রাম বনবাসে চলে যাবে সে কিছুই করতে পারবে না।

রামচন্দ্র ডাকলেন,—মিতা !

গুহক তাকাল চোখতুলে।

রামচন্দ্র বল্লেন,—এই গঙ্গা পার হয়ে আমায় যেতে হবে ওপারের বনে। তুমি আমাদের পার হবার ব্যবস্থা করে দাও।

গুহক চকিত হয়ে উঠল। তাই তো, তার মিতা পার হবে গঙ্গা। সে নৌকা তো তাকেই তৈরী করে দিতে হবে। হাঁক দিয়ে সে ডাকল চণ্ডালপাড়ার সবাইকে,—নৌকা তৈরী কর। নৌকা তৈরী হতে লাগল।

গুহক এল। নিজের হাতে বয়ে নিয়ে এল মধু আর ফল। বলল,—মিতা অনেক দূরের পথ এসেছিস্। মধু আর ফল খা।

রামচন্দ্র বল্লেন,—না মিতা, আজ আর তোমার কাছে কিছু নিতে পারব না।

চমকে উঠল গুহক,—সে কী কথা। তার মিতা তার বয়ে আনা ফল খাবে না? কিন্তু কেন? সে চণ্ডাল বলে। অস্পৃশ্য বলে। কিন্তু কেমন করে তা হবে। কতদিন একই পাত্র থেকে দুজনে খেয়েছে তারা। চণ্ডাল বলে রাম তো তাকে তুচ্ছ করেনি।

রামচন্দ্র তার মনের কথা বুঝলেন। তার পিঠে হাত দিয়ে বল্লেন,—ভুল কোরো না মিতা। আমি আজ থেকে সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী তো কারও কাছ থেকে কিছু নিতে পারে না। তাতে তার সন্ন্যাসব্রত ভঙ্গ হয়। চৌদ্দ বছর পরে আবার যখন ফিরব আমি এই পথ দিয়েই ফিরব বন্ধু। তখন তোমার হাতের মধু আর ফল খেয়ে আমার ক্ষুধা আর তৃষ্ণা দূর করব।

গুহক আর সহ্য করতে পারল না। রামচন্দ্রকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

চন্দন কাঠে তৈরী নৌকা। সাজানো হল ফুল দিয়ে আর পাতা দিয়ে। চণ্ডালপাড়ার শক্ত জোয়ান মাঝি চেপে ধরল নৌকার হাল। গেরুয়া রংয়ের কাপড় উড়ল নৌকার পাল হয়ে। সীতা উঠলেন নৌকার পরে। যেন সোনার পদ্ম ফুটল নৌকায়।

গুহককে আলিঙ্গন করে বিদায় দিয়ে রামলক্ষ্মণ উঠলেন নৌকায়।

রাজহাঁসের মত নৌকা ভেসে চল্ল গঙ্গার বুকে। গুহক তাকিয়ে রইল সেদিকে। চোখে তার পলক পড়ে না। রামলক্ষ্মণ সীতার নৌকা ভেসে গেছে গঙ্গার বুকের উপর দিয়ে।

গুহকের কিছু ভাল লাগে না। দিন গণনা করে তার সময় কাটে। চৌদ্দ বছর। সে কত দিন? কত মাস? কত যুগ?

হঠাৎ একদিন অযোধ্যার দিক থেকে অনেক লোকজন আর অনেক সৈন্যের আনাগোনা। গুহকের চমক লাগে। কি ব্যাপার ? খবর নিল সে। রাজপুত্র ভরত আসছেন। সঙ্গে তাঁর অনেক সৈন্য সামন্ত অনেক লোকজন। ভরত চলেছেন রামচন্দ্রের কাছে।

গুহক মনে মনে ভাবে,—রাজ্য সিংহাসন সবই তো নিয়েছে ভরত। তবে আবার রামচন্দ্রের খোঁজ করা কেন ? হঠাৎ অশুভ চিন্তা মনে আসে ! ভরত কেন আসছে ! রামচন্দ্রকে হত্যা করতে নয়ত ? মনে হতেই ক্ষেপে উঠল গুহক। হাঁক দিয়ে জড় করল সমস্ত চণ্ডালপাড়াকে। হুকুম দিল একটি প্রাণীও যেন গঙ্গা পার না হতে পারে। মিতার অনিষ্ট কেমন করে করবে ভরত।

হাজার হাজার চণ্ডাল তীর ধনুক নিয়ে তৈরী হয়ে রইল। গুহক নিজে দাঁড়িয়ে সবার আগে। এমন সময় গুহক দেখল খালি পায়ে মাথায় জটা, গাছের বাকল পরা শ্যামলবর্ণের দেহ কে এগিয়ে আসছে তার দিকে ? চমকে উঠল গুহক। তার মিতা কি ? রামচন্দ্র কি ফিরে এল ? পরক্ষণেই তার ভুল ভাঙ্গল। না না মিতা নয়। ভরত আসছে। কিন্তু অমন বেশে কেন ? এতো যুদ্ধের বেশ নয়।

গুহকের কাছে এসে ভরত দাঁড়ালেন। দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন গুহককে। কেঁদে বল্লেন,—মিতা, দাদা কোথায় ? তাঁকে আমি অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব। সিংহাসন খালি পড়ে আছে। অযোধ্যার নরনারী কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছে।

গুহক লজ্জায় মরে গেল। এই ভাইকে সে সন্দেহ করেছিল !

তারপর শত শত নৌকা নিয়ে এল ভরতকে আর তার সঙ্গের লোকজনকে পার করে দেবার জন্য।

তারপর একদিন ভরত ফিরে এলেন। রামচন্দ্র ফিরলেন না। ভরত এনেছিলেন তাঁর পাদুকা। সিংহাসনে সেই পাদুকা অর্থাৎ খড়ম রেখে রামের নামে ভরত রাজ্যশাসন করেছেন। ফেরার পথে ভরত গুহককে দেখিয়েছিলেন রামের খড়ম জোড়া। খড়ম জোড়া বুকে চেপে ধরে চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল গুহক চণ্ডাল।

তারপর কতদিন কেটে গেছে। কত যুগ, কত বছর গুহকের মনে তার কোন হিসাব নেই। মূর্খ চণ্ডাল সে। তার কি দিনের হিসাব আছে কিছু ?

গুহক সারাদিনরাত বসে থাকে গঙ্গার খেয়াঘাটের কাছে। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। কবে ফিরে আসবে তার শ্যামলসুন্দর বন্ধু। এসে দাঁড়াবে নদীর ওপারে, ডাকবে 'মিতা' বলে। বলবে, 'মিতা পার করে নাও আমাদের।' তারই প্রতীক্ষায় আছে গুহক চণ্ডাল। কি জানি কখন সে আসবে ? গভীর রাত্রে না ভোরের উষায় না সাঁঝের তারাটি যখন আকাশপথে উঠবে ? রাজহাঁসের মত সুন্দর হালকা নৌকাটি তার সাজানোই থাকে। প্রতিদিন নতুন করে সাজায় গুহক নৌকাটিকে।

দিনে দিনে রোগা হয়ে গেল গুহক। চোখের দৃষ্টি এল কমে। তবু কান পেতে বসে থাকে কখন আসবে তার মিতার ডাক। অবশেষে একদিন প্রতীক্ষা সফল হয়ে ওঠে গুহকের। লঙ্কাজয় করে রাম ফিরে আসেন অযোধ্যার পথে। পুষ্পকরথ এসে থামে গঙ্গার ওপারে।

লক্ষ্মণ ত অবাক। পুষ্পক রথই তো গঙ্গা পার করে নিয়ে

যেতে পারে। এ রথ তো আকাশে উড়ে যেতে পারে। সমুদ্র পার হয়ে এল। ছোট গঙ্গা পার কেন হতে পারবে না ?

কিন্তু রামচন্দ্র পুষ্পকরথে গঙ্গা পার হলেন না। তিনি গঙ্গার পারে এসে দাঁড়ালেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আধ আলো আধ অন্ধকার। তারই মাঝে রামচন্দ্র লক্ষ্য করে দেখলেন ওপারে খেয়াঘাটে বসে একজন। কে সেই একজন রামচন্দ্রের চিনতে দেরী হলো না। মধুর স্বরে ডাকলেন,—মিতা, আমি এসেছি, পার কর আমাকে—সে ডাক এসে পৌঁছল এপারে।

চমকে উঠল গুহক। কে ডাকল তাকে ? তবে কি তার মিতা এসেছে ওপারে ? চোদ্দ বছর কি শেষ হল ? ভাসিয়ে দিল তার নৌকা ওপারের দিকে। থর থর কাঁপছে হাত। কতদিন পরে এসেছে রামচন্দ্র।

ঘাটে এসে নৌকা ভিড়ল। ঐ তো তার শ্যামল সুন্দর রামচন্দ্র দাঁড়িয়ে। মুখে হাসি—চোখে করুণা। হাত ধরে উঠে এলেন রামলক্ষ্মণ আর সীতা নৌকার পরে। নৌকা ফিরে চলল।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন,—ভাল ছিলে মিতা ?

গুহক কি বলবে ? ভাল সে কেমন করে থাকবে রামচন্দ্রকে বনে পাঠিয়ে ?

ঘাটে এসে থামল নৌকা।

রামচন্দ্র নেমে দাঁড়ালেন, বল্লেন,—কই মিতা চাকভাঙ্গা পদ্মমধু আর নানা ফল ?

গুহকের আনন্দ আর ধরে না। নিয়ে এল মধুর ভাঁড়, নিয়ে এল গাছের ফল। রামচন্দ্র হাত পেতে নিলেন, বল্লেন,—মিতা তুমি খাও। নিজেই তিনি দিলেন গুহকের মুখে তুলে। চোখে জল

মুখে হাসি গুহকের চোদ্দ বছরের সাধনা সফল হল।

সেদিন রাত্রি কাটল সেই নদীর তীরে। পুরাণো দিনের মত পাশাপাশি বসে রইল দুই বন্ধু। ভোর হল। পূর্বদিকের আকাশ রাঙা হয়ে উঠল। রামচন্দ্র বল্লেন,—মিতা এবার যাব অযোধ্যায়। তুমি এস আমার অভিষেকের সময়ে।

গুহক মাথা নাড়ল, না মিতা, আর নয়। তোমাকে দূরে রেখে আর আমি থাকব না। থাকতে পারব না। আমার সব দুঃখ শেষ হবে আজ এইখানেই।

রামচন্দ্রের কোলে মাথা রেখে গুহক চোখ বুজল। আর মেলল না। তিনবার রাম নাম উচ্চারণ করিয়ে যে পাপ বামদেব করেছিলেন তার প্রায়শ্চিত্ত করলেন রামচন্দ্রের পায়ের তলে। শাপমুক্ত হলেন বামদেব।

ভগীরথ ও গঙ্গা

রামায়ণের কাহিনী।

রাম জন্মাবার অনেক আগের কথা।

অযোধ্যার রাজা তখন সগর। যেমন বীর তেমনই ধার্মিক। আর তেমনই তাঁর ছেলেরা। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে তাদের তুলনা নেই। আর শুধুই কি তাই? রাজপুত্রেরা আবার যুদ্ধ-বিদ্যায় ভারী নিপুণ। স্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে তাদের সমান কেউ নেই। রাজার মনে ভারী সুখ আর শান্তি।

রাজার কুলপুরোহিত ছিলেন মহামুনি বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ সব সময়েই রাজার আর রাজ্যের কল্যাণ কামনা করতেন। তিনি একদিন রাজা সগরকে বল্লেন,—রাজা! আপনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন। আপনার রাজ্যে কিছুরই অভাব নেই। প্রজারা কল্যাণে আছে। রাজপুত্রেরা সকলেই বুদ্ধিমান, সৎ ও সুন্দর। আপনার যশ ও সুনামে সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ। কেবলমাত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ বাকী আছে। এই যজ্ঞ করলে আপনার পূর্ব-পুরুষেরা সকলেই স্বর্গে সুখী হবেন।

তখন সগররাজ যজ্ঞের আয়োজন করতে লাগলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ তখনকার দিনে প্রায় সব বড় রাজারাই করতেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের একটি নিয়ম ছিল। একটি সুন্দর সুলক্ষণ ঘোড়াকে ছেড়ে দিতেন। আর তার সঙ্গে থাকত রাজা, রাজ্যের বড় বড় বীর আর সৈন্যদল। যজ্ঞের ঘোড়া নিজের ইচ্ছামত এদেশ সেদেশ ঘুরে বেড়াত—আর তার পিছনে পিছনে যেত সৈন্যদল। কোনও

দেশের রাজা যদি সেই ঘোড়াকে ধরতেন তবে সেই রাজার সঙ্গে এই সৈন্যদলের যুদ্ধ হত। রাজা হেরে গেলে তাঁকে ঐ ঘোড়ার সঙ্গে যেতে হত। এইভাবে সমস্ত দেশ জয় করে সেই ঘোড়াকে ফিরিয়ে আনা হত দেশে। সেখানে সেই ঘোড়াকে যজ্ঞের কাছে বলি দেওয়া হত এবং তাকে আহুতি দেওয়া হত আগুনে। এইভাবে অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে পারলে স্বর্গ মর্ত্য পাতালে সে রাজার সমান আর কেউ থাকত না। যা খুসী তাই তিনি করতে পারতেন।

মহারাজ সগর অশ্বমেধ-যজ্ঞ করবেন। একেই তো তিনি মহাবীর, ধার্মিক ও সাধু। তার ওপরে যদি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন তবে তো কথাই নেই। ইচ্ছা করলে তখন তিনি স্বর্গের রাজাও হতে পারেন। কাজেই ইন্দ্র ভারী ভয় পেলেন সগর রাজার যজ্ঞ দেখে। তিনি ভাবলেন হয়ত বা রাজা যজ্ঞ শেষ করে ইন্দ্রের সিংহাসন কেড়ে নিতে চাইবেন। ইন্দ্র যজ্ঞ পণ্ড করে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি ছদ্মবেশে পৃথিবীতে এলেন আর মায়াবলে চুরি করলেন ঘোড়াকে। কেউ তাঁকে দেখতে পেল না। ঘোড়াটাকে নিয়ে সোজা চলে গেলেন পাতালে যেখানে কপিল-মুনির আশ্রম। কপিলমুনি তখন চোখ বুজে ধ্যান করছেন। ইন্দ্রকে তিনি দেখতেও পেলেন না। ইন্দ্র চুপি চুপি ঘোড়াটিকে তাঁর আশ্রমের উঠোনে বেঁধে দিয়ে চলে গেলেন।

ইন্দ্র চলে গেলেন স্বর্গে। এদিকে সগররাজের সৈন্যদলে মহা গোলমাল। ঘোড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেল ঘোড়া ? যজ্ঞের ঘোড়া হারানো মানে সর্বনাশ হওয়া। যদি ঘোড়া না পাওয়া যায় তবে যজ্ঞ শেষ হবে না। আর যজ্ঞ শেষ

না হলে সগর রাজার বংশই থাকবে না। রাজ্যের মহা অকল্যাণ হবে। খোঁজ খোঁজ খোঁজ, সৈন্যরা এদিক ওদিক খুঁজে বেড়াতে লাগল। সৈন্যদলে ছিলেন সগর রাজার ছেলেরা। আর সে ছেলে তো একটি দুটি নয়, একশ দুশও নয়। একেবারে ষাট হাজার ছেলে। তারা সবাই খুঁজল এদিক ওদিক। তারপরে ভয়ে ভয়ে ফিরে গেল অযোধ্যায়। সগর রাজা বসে আছেন। সামনে সাজানো ভূরি ভূরি যজ্ঞের নানা জিনিষ। ঘোড়ার অপেক্ষায় বসে আছেন তিনি। ভাবছেন কখন ছেলেরা ফিরে আসবে ঘোড়া নিয়ে। যজ্ঞে ঘোড়া আহুতি দেবেন তিনি, তাঁর জীবন সার্থক হবে। তাঁর পিতৃপুরুষেরা স্বর্গে সুখী হবেন। কিন্তু রাজপুত্রেরা ফিরে এল লজ্জায় মুখ কালো করে। ঘোড়া নেই, ঘোড়া চুরি গেছে। খবর শুনে সগররাজ চমকে উঠলেন। পৃথিবীতে তাঁর সমান বীর নেই। তাঁর যজ্ঞের ঘোড়া কে চুরি করবে? কার এত সাহস? রাজপুত্রদের তিনি বল্লেন,—সমস্ত পৃথিবী খুঁজে দেখ। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—কিছুই বাকী রেখনা। ঘোড়াকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। স্বর্গে আর মর্ত্যে যদি না পাও তবে পৃথিবীর মাটি খুঁড়ে দেখ—পাতালে যাও। কিন্তু আমি এখন যজ্ঞ করতে বসেছি। আমি নিজেই যেতাম। আমি তো উঠতে পারব না। যতক্ষণ না ঘোড়া তোমরা নিয়ে আসবে ততক্ষণ যজ্ঞ শেষ হবে না। আমারও অন্য কোনও কাজ করার উপায় নেই।

দিকে দিকে ছুটল সগর রাজার ছেলেরা, উত্তরে, পূর্বে, পশ্চিমে, দক্ষিণে। তাদের সৈন্যদের পায়ের ধুলোয় পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। ভয়ে পশু-পাখী বনের ভিতর লুকালো।

কিন্তু কোথাও সে যজ্ঞের ঘোড়া নেই। তখন সগর রাজপুত্ররা রেগে গেল। তারা পৃথিবী খুঁড়তে লাগল। ষাট হাজার ছেলে মিলে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে শেষে পাতালে গিয়ে হাজির হল। আর তাদের খোঁড়া জায়গায় জল ভরে গেল। সে কি বিশাল জল। এপার ওপার দেখা যায় না পাহাড়ের মত বড় বড় ঢেউ সব। সগর রাজার ছেলেরা খুঁড়েছিল সেজন্য এর নাম হল সাগর।

রাজপুত্রেরা তো পাতালে এল। ঘোড়া খুঁজতে খুঁজতে চলেছে তারা। শেষে এক সময়ে দেখল সামনে কপিল মুনির আশ্রম। মুনি তখনও চোখ বুজে ধ্যান করছেন। আর তাঁর আশ্রমের উঠোনে বাঁধা রয়েছে যজ্ঞের ঘোড়া। রাজপুত্রেরা সবাই ছুটে এলেন। আর মনে করলেন কপিল মুনিই ঐ ঘোড়াটিকে নিয়ে এসেছেন। তবে তো ঐ মুনিই ঘোড়াচোর। ওকে তো শাস্তি দেওয়া দরকার। রাজপুত্রেরা নানা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুনির দিকে ছুটে এল। সেই গোলমালে মুনির ধ্যান ভেঙ্গে গেল। তিনি দেখলেন রাজপুত্রেরা তাঁকে আক্রমণ করতে আসছে, কপিল মুনি খুব রেগে গেলেন। তিনি ভ্রুকুটি করে তাদের দিকে তাকিয়ে শাপ দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

এক বছর কেটে গেছে। সগর রাজা যজ্ঞের আসনে বসে আছেন। কখন ছেলেরা ফিরে আসবে তারই জন্য। কিন্তু তারা তো ফিরল না। শেষে সগর রাজা তাঁর পৌত্র অংশুমানকে পাঠালেন। ঘোড়াকে ফিরিয়ে আনতে হবেই। অংশুমান সমস্ত পৃথিবী খুঁজে দেখল। কোথাও ঘোড়া নেই, শেষে

পাতালে গিয়ে তিনি খোঁজ পেলেন। কপিল মুনির আশ্রমে ঘোড়া আছে। কিন্তু সগর রাজপুত্রেরা কোথায় ? তিনি কপিল মুনির স্তব করতে লাগলেন। তখন কপিল মুনি খুসী হয়ে চোখ মেললেন। অংশুমান তাঁকে প্রণাম করে রাজপুত্রদের খবর জিজ্ঞাসা করলেন। কপিল মুনি বল্লেন রাগ করে তিনি তাদের ভস্ম করে দিয়েছেন। অংশুমান অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। এবং পিতৃপুরুষের তর্পণের জন্য জল খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও এক ফোঁটাও জলও পেলেন না। তখন দেবতারা বল্লেন,—অংশুমান তুমি শোক কোরোনা। কপিল মুনির শাপে তোমার পিতৃপুরুষেরা ভস্ম হয়ে গেছেন। সাধারণ জলে তাঁদের তর্পণ করা উচিত নয়। গঙ্গার পবিত্র জলে তোমার পিতৃপুরুষের তর্পণ করবে। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই তিন লোকই তিনি পবিত্র করবেন এজন্য তিনি ত্রিলোক তারিণী। তাঁর জলে সগরসন্তানদের স্বর্গলাভ ঘটবে। হে বীর, তুমি যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে দেশে ফিরে যাও। তোমার পিতামহের যজ্ঞ শেষ হক।

অংশুমান এই কথা শুনে ঘোড়া নিয়ে ফিরে গেলেন। সগর রাজা সবকথা শুনলেন। শোকে তাঁর মন ভেঙ্গে গেল। তবুও অশ্বমেধ-যজ্ঞ তিনি শেষ করলেন। যজ্ঞের শেষে সবাই ভাবতে লাগলেন। গঙ্গাকে কিভাবে পৃথিবীতে আনা যায়। কিন্তু কেউই কিছু করতে পারলেন না।

সগর রাজা মারা গেলেন। অনেকদিন পরে এই বংশে জন্ম হল ভগীরথের। ভগীরথ ছিলেন সাধু, ধার্মিক আর বুদ্ধিমান। ইনি গঙ্গা আনার কথা শুনলেন। মনে মনে তখনই ঠিক করে ফেল্লেন, যে তিনি গঙ্গাকে নিয়ে আসবেন পৃথিবীতে।

রাজ্য ছেড়ে ভগীরথ এলেন হিমালয়পর্বতে। সেখানে কঠোর তপস্যা সুরু করলেন। কতদিন, কতমাস, কত বৎসর কেটে গেল। শেষে ভগীরথের তপস্যায় দেবতাদের আসন টলল। পিতামহ ব্রহ্মা এলেন। বল্লেন,—ভগীরথ! তোমার তপস্যায় আমি খুসা হয়েছি। তুমি কি চাও? আমার কাছে বর প্রার্থনা কর।

ভগীরথ বল্লেন,—আমি গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনতে চাই।

ব্রহ্মা বল্লেন,—তথাস্তু। তাই হবে। তুমি গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনতে পারবে। আর সেই গঙ্গার জলস্পর্শ করে পৃথিবীর সব পাপী-তাপীরা মুক্তি পাবে। তখন ভগীরথ জোড়হাত করে বল্লেন, —পিতামহ, এই গঙ্গা কে? কোথা থেকে স্থষ্টি হলেন? কেনই বা এঁর এত ক্ষমতা? আপনি দয়া করে আমাকে বলুন। তখন ব্রহ্মা বল্লেন,—ভগীরথ, তুমি পূর্বের কথা শোন।

অনেকদিন আগের কথা।

নারদমুনি স্বর্গে থাকেন। হাতে একখানি তারের বাজনা। বাজনাটির নাম বীণা। বীণাটি বাজিয়ে নারদ সারাদিনরাত শুধু গান করেন। আর ঘুরে ঘুরে বেড়ান। গান কখনও থামে না তাঁর। গুণ গুণ করে গান চলছেই। হরিভক্ত কিনা, তাই হরিনামই গান করেন। তিন ভুবন তাঁর সে গান শুনে মুগ্ধ। যে শোনে সেই আবার শুনতে চায়। দেখেশুনে নারদের হল ভারী অহঙ্কার। মনে মনে ভাবলেন আমার মত কেউ গাইতে পারে না। এমন স্থরজ্ঞান কারুর নেই। নারায়ণ কিন্তু সব বুঝতে পারলেন। তিনি মনে মনে হাসলেন। নারায়ণের আর এক নাম দর্পহারী মধুসূদন। দর্পহারী কথাটার

মানে হল যিনি দর্প চূর্ণ করেন। নারায়ণ ঠিক করলেন নারদের এই দর্প ভাঙ্গতে হবে। তিনি রাগ রাগিণীদের ডাকলেন। এঁরা হচ্ছেন স্বর্গের দেবদেবী। এঁরা গান আর নাচের দেবতা। ভুল সুরে গান করলে বা ভুল তালে নাচলে এঁরা খুব কষ্ট পান। নারায়ণ এঁদের ডেকে বল্লেন,—যে পথ দিয়ে নারদ রোজ বৈকুণ্ঠে আসেন, সেই পথের ধারে তোমরা শুয়ে থাক। তোমাদের হাত-পা গুলো মায়াবলে বিস্তার করে রাখ। দেখে যেন মনে হয় ভেঙ্গে গেছে।

রাগরাগিণীরা তো নারায়ণের কথা-মত তাদের হাত পা ভেঙ্গে চুরে শুয়ে রইলেন। ঠিক সময়ে নারদ তো বীণা বাজিয়ে গান করতে করতে আসছেন সে পথ দিয়ে। কিছুদূর এসেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। এ কি ব্যাপার? এরা কারা? আর এমন ভাবেই বা পড়ে আছে কেন? এদের হাত-পা এমন ভাঙ্গা কেন?

নারদ গান থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমরা কে? এমন ভাবেই বা পড়ে আছ কেন তোমরা?

রাগরাগিণী বল্ল,—আমাদের দুঃখের কথা কাকেই বা বলি? আমরা রাগরাগিণী। নারদ নামে একজন মুনি আছেন স্বর্গে। তিনি দিনরাত বীণা বাজিয়ে গান করেন। তাঁর গানের সবই ভুল সুর। আমরা নাচগানের দেবতা, ভুল সুরে গান করলে আমাদের দেহে ভারী কষ্ট হয়। অথচ নারদকে তা' বলার উপায় নেই। তিনি মনে মনে ভাবেন যে তাঁর গান বড় সুন্দর। ত্রিভুবনে তাঁর মত গাইয়ে আর নেই। সেইজন্যই আমাদের দেহ এমনভাবে বেঁকে চুরে গেছে। আমাদের দুঃখের আর শেষ নেই।

নারদ তো এসব কথা শুনে লজ্জায় মরে গেলেন। ছি ছি, তাঁর

জন্যই দেবতাদের এই কষ্ট। তাঁর চোখে জল এল। তিনি হাতজোড় করে বল্লেন,—হে রাগরাগিণী! আমিই সেই নারদ। আমারই ভুল সুরে গান গাওয়ার জন্য তোমাদের এই দশা। আমার অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেছে। তোমরা আমাকে মার্জনা কর। বল কি হলে তোমরা আবার তোমাদের আগের সুন্দর দেহ ফিরে পাবে?

রাগরাগিণীরা বল্ল,—একটিমাত্র উপায়েই আমরা আবার আগের দেহ ফিরে পেতে পারি। স্বর্গ, মর্ত্য আর পাতালে এই তিন জগতে সমস্ত রাগরাগিণীর যিনি দেবতা তিনি স্বয়ং মহাদেব। তাই তাঁর অন্য নাম নটরাজ। সেই নটরাজ শিব যদি গান করেন তবেই সেই অপূর্ব সুরে আমাদের বিকৃত দেহ আবার সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। অন্য কিছুতেই তা সম্ভব নয়। নারদ বল্লেন,—আমি এখনই যাচ্ছি নটরাজের কাছে। তাঁকে প্রসন্ন করে তাঁর দয়া আমি ভিক্ষা করব। তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রার্থনা শুনবেন।

তখন নারদ গেলেন কৈলাসে। শিবের কাছে সব কথা বল্লেন। শিব তো সর্বজ্ঞ। সবই জানেন। হেসে বল্লেন,—নারদ, গান করতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আমার গানের যোগ্য শ্রোতা কোথায়? কে আমার গান শুনবে? তুমি উপযুক্ত শ্রোতা খুঁজে বার কর।

নারদ কৈলাস ছেড়ে এলেন ব্রহ্মলোক। সেখানে পদ্মাসনে বসে আছেন চতুর্মুখ ব্রহ্মা। ত্রিজগতের সৃষ্টিকর্তা তিনি। তাই সকলের পিতামহ। নারদ তাকে প্রণাম করে বল্লেন,—পিতামহ! নটরাজ শিব গান করবেন। তাঁর গানের উপযুক্ত শ্রোতা ত্রিভুবনে আপনি ছাড়া আর কেউই নেই। আপনি চলুন।

পিতামহ ব্রহ্মা হাসলেন। বল্লেন,—নারদ, দেবাদিদেবের সঙ্গীত শুনতে পাওয়া মহা সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু একা আমি যাব না। ত্রিজগতের পালনকর্তা নারায়ণও এই অপূর্ব গানের শ্রোতা হবেন। তুমি মহাদেবকে নারায়ণের কাছে নিয়ে যাও। সেখানে আমি এবং নারায়ণ শিবের গান শুনব।

নারদ আবার কৈলাসে গেলেন শিবের কাছে। বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর কাছে শিব তাঁর সঙ্গীত স্থরু করলেন। সে গানের সুরে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই তিন জগৎ ভরে গেল। রাগরাগিণীরা সুন্দর দেহ লাভ করলেন। সংসারের শোক তাপ দূর হল। নারায়ণ সেই গানের অপূর্ব সুরে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ক্রমে তাঁর সমস্ত মন সেই গানের সুরে কোমল হয়ে এল। কোমল হয়ে গলে গেল তাঁর সমস্ত শরীর। পা দুখানি থেকে নেমে এল পবিত্র জলধারা। ব্রহ্মা তাঁর কমণ্ডলুতে সেই জল ধরে রাখলেন।

গান শেষ করে নটরাজ কৈলাসে ফিরে গেলেন। ব্রহ্মা ফিরে এলেন ব্রহ্মলোকে। কমণ্ডলুতে রইল সেই পুণ্য জলধারা। সংসারের পাপ-তাপ নাশিনী এই জলধারাই গঙ্গা।

ভগীরথ শুনলেন গঙ্গার কাহিনী। অনেক তপস্যার পরে ব্রহ্মার বর তিনি পেয়েছেন। এখন আবার নারায়ণকে প্রসন্ন করতে হবে। ভগীরথের তপস্যার টানে বিষ্ণু অর্থাৎ নারায়ণ এলেন। ভগীরথ তাঁর কাছে গঙ্গাকে প্রার্থনা করলেন। বিষ্ণু তাঁকে বর দিলেন। ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে গঙ্গা ছিলেন। বিষ্ণু তাকে আদেশ করলেন ভগীরথের সঙ্গে মর্ত্যে যেতে। নারায়ণ ভগীরথকে এক বিরাট শঙ্খ দিলেন। ভগীরথ সেই শঙ্খে ফুঁ দিলেন।

ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে কুলু কুলু শব্দ করে গঙ্গা নেমে এলেন। চারিদিকে দেবতা দানব, যক্ষ, রক্ষ গন্ধর্ব সবাই ভীড় করে দেখতে এল।



আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া
পশ্চাতে চলেন গঙ্গা নাচিয়া নাচিয়া

ব্রহ্মলোক থেকে গঙ্গা নামলেন। সেখান থেকে গঙ্গা এলেন সুমেরু পর্বতে। সুমেরু পর্বতে হাজারটা চূড়া আর পর্বতের মাঝখানে একটা বিরাট গর্ত। গঙ্গা সেই গর্তে পথ হারালেন। বারো বছর কেটে গেল। ভগীরথ জোড়হাতে

বল্লেন,—মা ! তুমি যদি সুমেরুতেই থাক তবে আমার বংশের উদ্ধার কেমন করে হবে ?

দেবী বল্লেন,—বাছা, আমি পথ দেখতে পাইনা। তুমি ঐরাবত হাতীকে ডেকে আন। ঐরাবত তার দাঁত দিয়ে চিরে দেবে পাহাড়ের পথ। আমি তবেই তোমার সঙ্গে যেতে পারব।

ভগীরথ ফিরে গেলেন দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে। ঐরাবত হল এক প্রকাণ্ড হাতী। সে হল দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন। ইন্দ্র ভগীরথের কাছে তার বিপদের কথা শুনলেন। তাঁর আদেশে ঐরাবত এল সুমেরু পর্বতে। তার বড় বড় দাঁত দিয়ে ভেঙ্গে দিল সুমেরু পর্বতের প্রাচীর। গঙ্গার পথ হল। এখানে গঙ্গা তিনটি ধারায় ভাগ হলেন। একটি ধারা স্বর্গে রইল তার নাম হল মন্দাকিনী, অন্য ধারাটি বইল পাতালে তার নাম ভোগবতী। আর মর্ত্যভূমির দিকে গঙ্গার যে ধারা নামল তার নাম অলকনন্দা। তিনলোকে প্রবাহিত বলে এঁর এক নাম ত্রিপথগা অর্থাৎ যিনি তিনটি পথে গমন করেন।

কিন্তু ভগীরথের বিপদ ঘটল আবার। পাহাড়ের উপর থেকে পৃথিবীতে গঙ্গা নামবেন। কিন্তু পৃথিবী কি সে বেগ সইতে পারবে। গঙ্গা ভগীরথকে বল্লেন,—ভগীরথ ! তুমি শিবের কাছে যাও। শিব এসে এই পাহাড়ের নীচে দাঁড়াবেন। আমি পাহাড়ের উপর থেকে শিবের জটার উপরে পড়ব। তারপর শিব আমাকে সেই জটা থেকে মুক্তি দিলে আমি পৃথিবীতে নামব।

ভগীরথ আবার ফিরলেন পৃথিবীতে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত, এই ছয়টি ঋতুতে সমানভাবে তিনি শিবের আরাধনা করলেন। গ্রীষ্মকালে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আর

চারপাশে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে তিনি তপস্যা করতেন। শীতকালে ঠাণ্ডা জলের মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবে থেকে তিনি তপস্যা করলেন। অবশেষে শিব প্রসন্ন হলেন। বল্লেন,—ভগীরথ! তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি। তুমি কি চাও বল।

ভগীরথ তাঁর প্রার্থনা শিবের কাছে নিবেদন করলেন। শিব এলেন কৈলাসপর্বতের নীচে। সেখানে মাথার জটা পেতে দাঁড়ালেন। কৈলাসের উপর থেকে ঝর ঝর করে ঝরে পড়তে লাগল দেবী অলকনন্দার স্রোত। ভগীরথ সেখানে হাঁটুগেড়ে হাতজোড় করে বসে রইলেন। কি সুন্দর দৃশ্য। দেবতারা এলেন সে দৃশ্য দেখতে। যক্ষরা এল। রক্ষরা এল। মুনি-ঋষি সকলে নিজেদের তপস্যা ভুলে সেখানে এলেন। এঁদের গায়ের জ্যোতিতে চারদিক আলো হয়ে গেল। গঙ্গা পৃথিবীতে নামছেন, পৃথিবীর সব দুঃখ-জ্বালা, সব পাপ দূর করার জন্য। এমন জিনিষ কি কেউ না দেখে পারে? জটায় গঙ্গাকে ধারণ করে শিব হলেন গঙ্গাধর।

কিন্তু শিবের মাথার জটা বড় সহজ জিনিষ নয়। ভয়ঙ্কর সেই জটা। গঙ্গা আর পথ পান না। শিবের মাথায় তাঁর দিন কাটে, মাস কাটে, বৎসর কাটে। ভগীরথ আবার জোড় হাত করে বল্লেন,—হে ভোলানাথ! তোমার ধ্যান ভাঙ্গুক। গঙ্গাকে তোমার জটা থেকে মুক্তি দাও। শিব জটা চিরে গঙ্গাকে পথ করে দিলেন। শিবের জটা থেকে গঙ্গা নেমে এলেন যেখানে, সেই জায়গাটির নাম হরিদ্বার। হরিদ্বারের মত পুণ্য তীর্থ আর নেই। হরিদ্বার ছেড়ে গঙ্গা এলেন। এসে মিশলেন যমুনা আর সরস্বতী নদীর সঙ্গে। তিনটি নদী যেখানে মিশলেন তার নাম হল

ত্রিবেণী। এখানেই প্রয়াগ তীর্থ। ত্রিবেণী পার হয়ে গঙ্গা এলেন বারাণসী ধামে। বারাণসীর আর এক নাম কাশী। কাশীধামে দেবী গঙ্গা উত্তরবাহিনী হয়ে রইলেন। কাশীধাম পরম পুণ্যস্থান হয়ে রইল।

ভগীরথ চলেছেন আগে আগে। পিছনে চলেছেন ত্রিভুবন-তারিণী গঙ্গা। কত পাপী পাপমুক্ত হল, কত শোক দূর হ'ল গঙ্গার জলের স্পর্শে। কত দেশের দুধারের পলি মাটিতে জন্মালো সোনার মত শস্য। দেশে লক্ষ্মীশ্রী এল। দুর্ভিক্ষের ভয় রইল না।

দেবী বয়ে চলেছেন। দেবীর পথে পড়ল সুন্দর সাজানো একটি আশ্রম। জহ্নু মুনি বসেছেন তপস্যায়। গঙ্গার আর দেরি সইল না। মুনির আসনের উপর দিয়ে খরবেগে বইলেন। ভেসে গেল লতায় পাতায় গড়া সুন্দর আশ্রমটি। গায়ে জল লাগতেই মুনি চোখ মেললেন। দেখলেন কল কল করে গঙ্গা বয়ে চলেছেন একূল ওকূল দুকূল ভাসিয়ে। মুনির রাগ হল ভীষণ। এত সাহস গঙ্গার! মহাক্রোধে জহ্নু মুনি এক গণ্ডূষে সমস্ত গঙ্গা পান করে ফেললেন।

ওদিকে ভগীরথ শঙ্খ বাজিয়ে আগে আগে চলেছেন। কিছুদূর গিয়ে তাঁর খেয়াল হল গঙ্গার কলধ্বনি আর শোনা যাচ্ছে না। ব্যস্ত হয়ে তিনি পিছন ফিরে চাইলেন। কোথাও গঙ্গা নেই। তাড়াতাড়ি তিনি ফিরে এলেন। দেখেন বিশাল বটগাছের ছায়ায় জহ্নু মুনি তপস্যায় বসেছেন। প্রণাম করে বিনয়ের সঙ্গে ভগীরথ জিজ্ঞাসা করলেন,—প্রভু! আপনি কি জানেন দেবী গঙ্গা কোনপথে গেছেন!

মুনি বল্লেন,—তুমি গঙ্গাকে আমার আশ্রমের উপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলে। সেইজন্য গঙ্গাকে আমি গণ্ডূষ করে পান করেছি। ভগীরথ মহাবিপদে পড়লেন। করজোড়ে তিনি মুনির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। জহ্নু মুনি প্রসন্ন হলেন। বল্লেন,—ভগীরথ! গঙ্গাকে আমি পান করেছি, এখন যদি তাকে মুখ দিয়ে বের করি তবে গঙ্গার জলকে সবাই উচ্ছিষ্ট বলবে। আমি আমার জানু চিরে গঙ্গাকে বাইরে যাবার পথ করে দিচ্ছি। এই বলে জহ্নু মুনি তাঁর জানু অর্থাৎ হাঁটু চিরে ফেল্লেন। জহ্নু মুনিকে প্রণাম করে গঙ্গা তাঁর অপরাধের জন্য মার্জনা চাইলেন। জহ্নু মুনি হতে জন্মালেন সেজন্য গঙ্গার নাম হল জাহ্নবী অর্থাৎ জহ্নু মুনির কন্যা।

নানা দেশ ঘুরে জাহ্নবী অবশেষে এলেন পাতালে। সেখানে তিনি সগররাজপুত্রদের ভস্মের উপর দিয়ে বইলেন। তাঁর স্পর্শে সগরবংশের উদ্ধার হল। রাজপুত্রদের আত্মা স্বর্গে গেল। ভগীরথের সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হল। তিনি গঙ্গাজলে তার পিতৃপুরুষদের তর্পণ করলেন।

গঙ্গাদেবী ভগীরথকে বল্লেন,—তোমার বংশের উদ্ধার হল। তুমি এবার নিশ্চিন্তে ও সুখে রাজত্ব কর। আমি এবার সাগরের সঙ্গে মিলিত হই। গঙ্গা সাগরে প্রবেশ করলেন। সে জায়গাটির নাম হল গঙ্গাসাগরসঙ্গম। অর্থাৎ গঙ্গা আর সাগরের মিলন-স্থল। সমস্ত তীর্থের মধ্যে এও হল অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

ভগীরথের যত্নে গঙ্গা পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাই তিনি ভগীরথের মেয়ের মত। সেজন্য গঙ্গার আর এক নাম ভাগীরথী। পুরাণে বলে গঙ্গার বাহন মকর। তাই পৌষ সংক্রান্তির দিনে মকরবাহিনী গঙ্গার পূজা হয় সাগর সঙ্গমে।

সহজবোধ্য কয়েকখানি বই

শরীর ভাল রাখতে হলে

পুরাণ-কথা

গ্রামের সমাজ

মোরগ ও মুরগী

ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড